BALURGHAT B.ED. COLLEGE

NAAC Accredited

Mangalpur, P.O. Balurghat, Dakshin Dinajpur-733101

(Recognized by N.C.T.E. & UGC under Section 2(f) & 12(B), Affiliated to The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration & West Bengal Board of Primary Education Approved by Higher Education Department (CS Branch), Govt. of West Bengal Monitored, Maintained, Run and Managed by Balurghat Educational Promotion and Welfare Trust, Balurghat

BALURGHAT B.Ed. COLLEGE • Estd. 2004 •

ভাবীকাল

Phone : (03522)259179 (College), 271515 (Management), FAX : 03522-271515
Website- www.balurghatbedcollege.org, e-mail: balurbedcollege@gmail.com

Dr. Nirmalya Banerjee, Hon'ble Member- Secretary West Bengal State Council of Higher Education inspected Balurghat B.Ed. College on 20-02-2004

Hon'ble Vice- Chancellor of University of North Bengal deputed an Inspection Team on 24-06-2004 at Balurghat B.Ed. College

Dr. V.K. Sunwani & Dr. Bhagaban Subudhi
(Experts of ERC, NCTE)
Inspected our College on 18-05-2005

BALURGHAT B.ED. COLLEGE

MAGAZINE COMMITTEE – 2021-2022

Adviser	**:**	Sri Haripada Saha Dr. Ashish Kumar Das Dr. Kalyan Pandey Sri Binoy Kumar Goswami
President	**:**	Dr. Bobby Mahanta, Principal
Teachers Representative	**:**	Sri Chand Kumar Das Dr. Saurabh Mandal Dr. Uttam Kumar Maji Sri Samir Basak Sri Achyutananda Mandal
Magazine Secretary	**:**	Susmita Kundu
Assist. Secretary	**:**	Subhra Ghosh
Members	**:**	Bittu Roy
	:	Antalina Mahanta
	:	Subhasish Sarkar
	:	Ritu Basak

This is an institutional pride for our college to maintain the tradition of publication of college magazine entitled "BHABIKAL" every academic year. The quality and standard of the magazine is praised and appreciated by the teacher community and educated society. Research based and creative writings by both teachers and students have enriched not only the magazine but also the students and teachers of the college. Above all the magazine has been plays a very significant role as the breeding ground for students as prospective writers as well as for teachers as prospective researchers in different fields of knowledge since its first publication in 2005. I congratulate the magazine committee for taking pains to bring the magazine out in time and thank from the core of my hart all concerned in its timely publication.

Dr. Naba Kumar Das

President

Balurghat B.Ed. College

সম্পাদকীয়

বসন্তের শেষে গ্রীষ্মের আগমনের পথ যেমন নিয়ে আসে একরাশ আনন্দ, কৃষ্ণচূড়া এবং পলাশের আগুন যেভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়, সেই আনন্দ ঠিক সেরকমই ভাব বিনিময় যা অভিধানের এক অন্যতম পথিকৃত ভবিষ্যতের ধারণাকে নিয়েই এ বারের বার্ষিক পত্রিকা ''ভাবীকাল'' প্রকাশ। ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পূরবী' কাব্যের 'ভাবীকাল' কবিতায় তিনি লিখছেন—

''দূর ভাবী শতাব্দীর অয়ি সপ্তদশী
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি'।
আকাশেতে শশী
ছন্দের ভরিয়া রন্ধ্র ঢালিছে গভীর নীরবতা
কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা।''

কবিতাটিতে যেমন করে ভবিষ্যতের ভাবনাকে এক নতুন পথ দেখায় তেমনি আমাদের ''ভাবীকাল'' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্মৃতিশক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশ লাভ করে আগামীদিনের নয়া পথ দেখাবে।

প্রতিভা বিকশিত হয় সাহিত্য চর্চ্চার মাধ্যমে। আমাদের চিন্তা, কল্পনা, অনুভূতি শক্তির উন্নয়ন সম্ভব একমাত্র লেখনীর সাহায্যে। তাই ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বিকাশের কথা অনুধাবন করেই 'বালুরঘাট বি.এড. কলেজ' প্রতি বছরের মতো এ-বছরেও পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। আমরা জানি কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে অনেক 'ফারাক' থাকলেও আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস হলেও আশা আমাদের অনেক অনেক বেশি। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ সাহিত্য, অণুনাটক লেখার মাধ্যমে ভাবীকালের শিক্ষক হিসাবে আগামীতে আমরা যথাযথ সমাজ গড়তে সচেষ্ট হব।

'ভাবীকাল' পত্রিকাটি প্রকাশনার জন্য যারা উদ্যোগী হয়েছে, সম্ভবায়নের যথাসম্ভব আয়োজন করেছে এবং আয়াস সাধ্য নিরলস পরিশ্রম করে শেষ মুহূর্তে প্রকাশিত করলেন তাদের চেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই আমাদের সহপাঠী কলেজের প্রতিটি বিভাগের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের। আগামীতে আমাদের পত্রিকার সার্বিক মান-উন্নয়নের জন্য তাঁদের আগ্রহ ও উদ্যোগের আশা রাখি।

পত্রিকা প্রকাশনায় সাহিত্যিক তথা শিক্ষক শ্রী মৃণাল চক্রবর্তী, কলেজের অধ্যক্ষা ড. ববি মহন্ত ও সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দদের সহৃদয় সহযোগিতার অভাব ঘটেনি। ভবিষ্যতেও প্রত্যেকের পারস্পরিক আন্তরিক সহযোগিতার প্রত্যাশা রেখে সকলকে প্রণাম, শ্রদ্ধা ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আর যাঁর কথা না লিখলে কেমন যেন অসম্পূর্ণতা মনে হয়, তিনি বালুরঘাটের সম্মাননীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ড. নবকুমার দাস-এর পরম আশার ও প্রত্যাশার ফসল 'বালুরঘাট বি.এড. কলেজ' তাঁকে সকল ছাত্র- ছাত্রীদের পক্ষ থেকে জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

'ভাবীকাল'-এর ভাল-মন্দ, ত্রুটি-বিচ্যুতি যা কিছু সব কবিগুরুর পদকমলে অর্পণ করলাম—শ্রদ্ধাবনত চিত্তে।

সুস্মিতা কুণ্ডু
সম্পাদক
ভাবীকাল
বালুরঘাট বি.এড. কলেজ
মঙ্গলপুর, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

FROM THE DESK OF PRINCIPAL...

Dr. Bobby Mahanta

Principal, Balurghat B.Ed. College

It can rightly be said that dream will never work unless we strive to achieve it. Hence, in a simple way it is rephrased as "Don't dream about success, work for it". To dream is sweet and to achieve it is sweeter. Balurghat B.Ed. College is a representation of quality teacher education with a progressive outlook for producing quality teachers to impart quality education to students in order to generate expected citizenship quality in students who will acquire new experiences of success which will be an effective instrument for nation re-building.

The College was established on 07th July, 2004 under the leadership of Dr. Naba Kumar Das, the President of the college. The College has flourished with regional as well as national recognition as one of the institutions of teacher education of excellence at the national level with supportive and collaborative co-operation between dedicated team of the founders of the college and the Trust. It has a clear vision and mission with a set of rules and regulations. I am proud to be associated with this institution as I am getting a scope to contribute to our collective efforts to make India a better nation through quality education. Any one being associated with us will realize that initiatives are taken to create a joyful learning environment and develop individuals in the global perspective.

The College endeavours to groom our students to shape and develop healthy personalities. To achieve this goal a team of qualified, experienced and dedicated teachers and staff are engaged in nurturing the students to reach their optimal potential. The infrastructure, facilities, equipments, learning materials etc. are made available to create a learner-friendly environment in the college. The be-all and end-all of our collective effort is to imprint into the students' mind strong values and imbibe the potentialities require for being good members of the society and responsible citizens of the nation.

I personally congratulate the Editorial Board on their tireless efforts in bringing out this publication of the College Magazine 'Bhabikal'. In addition to this, I extend my sincere thanks to the persons who have contributed to this issue and enhanced its level of quality through their articles, short stories, poems etc.

I want each one of you to have fond memories of being associated with us and always trying to do good for the college, education and humankind.

I welcome suggestions and feed-backs from all for improving ourselves and building a strong bond of under-standing and relationship for today, tomorrow and forever. My message is to stop not till the excellence and quality of education is enhanced to the expected level. I strongly believe that we can flourish and expand our mission by working together to serve the society.

I take this opportunity to acknow-ledge the extreme hard work of our able management, dedicated teaching and non-teaching staff and other like-minded persons and organizations.

May we all be blessed!!

Biplab Mitra
Minister-in-Charge
Agricultural Marketing Department
Government of West Bengal

KHADYA BHAWAN "B" Block (4th Floor)
11A, Mirza Ghalib Street, Kolkata - 700 087
Phone : 033 2252 0604 (O)
Fax : 033 2252 0307
Mobile : 9679414408 / 9434106316
E-mail : biplabkumar.mitra@yahoo.com

Message

*I am glad to know that "**BALURGHAT B.Ed. COLLEGE**" is bringing out its annual Magazine, containing their self-composed writings and drawings of the Students and Teachers named "**BHABHIKAL**".*

I hope their Magazine will be enriched by the writings of literature, economics, social affairs and so on which will throw lights on their paths of enlightenment.

I wish their Magazine all success.

B Mitra
(Biplab Mitra) 27/4/2022
BIPLAB MITRA
Minister-In-Charge
Agricultural Marketing Department
Govt of West Bengal

Dakshin Dinajpur Zilla Parishad
Balurghat

Lipika Roy
Sabhadhipati
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad
Balurghat - 733101
03522-255356 (R)
03522-255229 (O)
Mob. : 9434055107

লিপিকা রায়
সভাধিপতি
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ
বালুরঘাট - ৭৩৩১০১
০৩৫২২-২৫৫৩৫৬ (বাড়ী)
০৩৫২২-২৫৫২২৯ (অফি)
মোবাইল - ৯৪৩৪০৫৫১০৭

Memo No. .... *Date*..২৬/০৫/২০২২

শুভেচ্ছা বার্তা

একথা জেনে আনন্দিত হলাম যে বালুরঘাট বি.এড. কলেজ তাঁদের বার্ষিক ম্যাগাজিন পত্রিকা যার নাম 'ভাবীকাল' প্রকাশিত হতে চলেছে।

আমি এই পত্রিকা প্রকাশের সাফল্য কামনা করি।

আরো জানাই যে বর্তমান সমাজের সামাজিক প্রেক্ষাপটে আপনাদের এই উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয়। আমি এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

লিপিকা রায় ২৬/০৫/২২
সভাধিপতি,
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ

প্রতিঃ ডঃ নব কুমার দাস
সভাপতি
বালুরঘাট বি. এড. কলেজ
মঙ্গলপুর, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

Prof. (Dr.) Soma Bandyopadhyay
(M.A., Ph.D)
Vice-Chancellor

THE WEST BENGAL UNIVERSITY OF TEACHERS' TRAINING,
EDUCATION PLANNING AND ADMINISTRATION
25/2 and 25/3, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700 019
E-mail : wbuttepa@gmail.com
Website : www.wbuttepa.ac.in

May 5, 2022

MESSAGE

I am happy to know that the authorities of Balurghat B.Ed. College is going to publish its Annual Magazine " **BHABHIKAL**".

I believe that Annual Magazine containing valuable articles from the teachers, students and scholars, will be educative and informative.

I convey my best wishes to the teachers, students, non-teaching staff and also those who are associated with this publication.

I wish the College authorities every success, in their future endeavours.

(Prof. Soma Bandyopadhyay)

Vice-Chancellor

PROFESSOR (DR.) MITA BANERJEE
Vice Chancellor, Kanyashree University
Vice Chancellor, Murshidabad University (Additional Charge)

Former Vice Chancellor, The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration.
Former Professor Emeritus, Former Pro Vice Chancellor & Former Dean, Adamas University.
Former Chief Advisor, Center for Advanced Studies and Research in Education.
Former member of a High powered Committee of NCTE, New Delhi.
Former Chairperson of Two Curriculum Committees, Higher Education Department, Government of West Bengal.
Former Professor, Department of Education, University of Calcutta.

Ref. No: KSRU-VC- 118/22 **Date: 20.05.2022**

Message

It is my pleasure to write a message for Balurghat B.Ed. College for their College Annual Magazine 'BHABHIKAL'. This College is serving the society successfully since 2004. I am glad that this College is publishing an Annual Magazine for the benefit of students and teachers. This Magazine will reach great heights with the contributions of students and teachers through their creative and research based articles. This Magazine will serve to bring out many hidden talents and help them to flourish in their own way.

I wish this Magazine a grand success and also wish Balurghat B.Ed. College continues with this endeavor to publish the Magazine for years to come.

With good wishes,

Mita Banerjee

Prof. (Dr.) Mita Banerjee
Vice Chancellor
Kanyashree University
Vice Chancellor (Additional Charge)
Murshidabad University

Official E-mail: kanyashreeuniversity@rediffmail.com, kanyashreeuniversity@gmail.com

DAKSHIN DINAJPUR UNIVERSITY

Prof. Sanchari Roy Mukherjee
Vice Chancellor

Address for Correspondance :
North Chakbhawani,
(Near LIC Office), Balurghat,
Dakshin Dinajpur, WB – 733101.
Contact No. – +91-9832068254
Email – vc@dduniv.ac.in

2 May 2022

To
Dr. Naba Kumar Das
President
Balurghat B.Ed. College
Balurghat
Dakshin Dinajpur District

Dear Dr. Das,

Greetings!

It gives me immense pleasure to note that Balurghat B.Ed. College is going to publish its Annual Magazine, *"BHABHIKAL'*. As the name indicates *Bhabhikal*, the contents must be looking to the future and will act as an inspiring force for the students for years to come. Such magazines nurture creative faculties beyond the classroom and textbooks.

I sincerely appreciate your endeavour and wish the Magazine and also your Institution a glorious future.

Wish you all the very best,

With sincere regards,

Sanchari Roy Mukherjee

(Sanchari Roy Mukherjee)
Vice Chancellor
Dakshin Dinajpur University &
Raiganj University (Addl. Charge)

Vice-Chancellor
Dakshin Dinajpur University

District Magistrate & Collector
Dakshin Dinajpur

No. 133 **Date:** 26-04-2022

MESSAGE

I am delighted to know that Balurghat B.Ed. College is bringing out its annual magazine entitled **"BHABHIKAL"**. Reading magazine opens one's mind to the wide world outside, broadens one's thinking and strengthens one's convictions, and moreover, magazines have a special role in promoting reading habit among people. As Mark Twain rightly said, 'The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them'. Such publication is indeed an encouraging initiative in the gloomy times of COVID-19 pandemic

I take this opportunity to convey my good wishes to all teachers and students of Balurghat B.Ed. College and wish the annual magazine a grand success.

Ayesha Rani

Smt. Ayesha Rani A., I.A.S.
District Magistrate
Dakshin Dinajpur
District Magistrate
Dakshin Dinajpur, Balurghat

To
The President,
Balurghat B.Ed. College,

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DAKSHIN DINAJPUR
BALURGHAT

P.O. : Balurghat, Dist. : Dakshin Dinajpur, West Bengal, PIN : 733101 Office Tel. : 03522-255201, Fax : 03522-255488, Mob. : 9434055201 Residence : 03522-255202, e-mail : dm-bgt-wb@nic.in

The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration

25/2 & 25/3, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700019

Date-20.05.2022

Message

It is a pleasure knowing that Balurghat B.Ed. College, Dakshin Dinajpur, is going to publish its college magazine 'BHABHIKAL'. I am sure that the magazine will have quite a few enriched thought provoking writings and I wish a very bright and prosperous future of the same. I am confident that 'BHABHIKAL' will express itself in 'wisdom' within a short span of time.

(Sri Kunal Kanti Jha)

Registrar

Registrar
The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning And Administration

Dr.Naba kumar Das
President
Balurghat B.Ed. College
P.O Balurghat
Dist. Dakshin Dinajpur

DAKSHIN DINAJPUR UNIVERSITY

Dr. Pankaj Kundu
Registrar (Addl. Chg.)

Address for Correspondance :
North Chakbhawani,
(Near LIC Office), Balurghat,
Dakshin Dinajpur, WB – 733101.
Mobile No. – +91-8348229018
Email – registrarddu21@gmail.com

Ref. No. : DDU-22/GL/012

Date : 23.05.2022

Message

I am extremely happy to know that Balurghat B.Ed. College, Balurghat, is bringing out its annual magazine 'Bhabhikal' which provides the teachers and students a forum to express their ideas and thoughts in a creative manner. I am sure this creative endeavour will produce an array of artistic and scientific expressions with distinct individual signatures.

I send my felicitations and best wishes to the convener and the committee members on their successful efforts to bring out the annual magazine.

P. Kundu
(Dr. Pankaj Kundu)

Mahinagar, Dakshin Dinajpur, West Bengal – 733103. Off. : 03522-796202 www.dduniv.ac.in

Government of West Bengal
Office of the District Inspector of Schools (SE)
P.O: Beltala Park, Balurghat, Dakshin Dinajpur

Massage

I am extremely overwhelmed to know that the annual magazine entitled "BHABHIKAL" is going to be published shortly. It will help the students to cultivate their knowledge and leadership quality for future India.

I convey my best wishes to all those associated with the school.

Mrinmoy Ghosh
District Inspector of Schools (SE)
Dakshin Dinajpur

To,
The President
Balurghat B.Ed College.

প্রবন্ধ

শিশুর অপরাধ প্রবণতা ও পিতামাতার দায়িত্ব

শিল্পী জোয়াদ্দার

বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

শুনতে খারাপ লাগলেও একথা সত্যি যে অপরাধ প্রবণতা মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এই প্রবণতা ছোটো থেকেই নিহিত থাকে। প্রবণতাকে অবদমন করে বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করে শিক্ষা। বাড়ি পরিবেশ, পিতামাতা বা আত্মীয়ের উপর নির্ভর করে শিশুর বিকাশে সদ্গুণগুলি উঠে আসবে না বদগুণগুলি? তবে একটি শিশুকে দেখে বা তার কয়েকটি আচরণ দেখে কখনই ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না যে শিশুটি বড়ো হয়ে কী হবে?

আমরা প্রায়ই দেখে থাকি কোন একটি শিশুকে তার সহপাঠী মারলে বা আঘাত করলে সেও তাকে মারতে বা আঘাত করতে দ্বিধা করে না। এটাও মানুষের একটা সহজাত প্রবণতা। দেখা যায় ছোটোবেলাই যে শিশু খুব দুরন্ত মারকুটে সেই বড়ো হয়ে সমাজের কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হয়েছে। আবার কোনো সময় এমনও দেখা গেছে যে, অত্যন্ত মেধাবী, নম্র, ভদ্র পরিবারের শিশু কেমন করে সঙ্গদোষে নষ্ট হয়ে যায়। সে ধীরে ধীরে সমাজবিরোধী হয়ে ওঠে। তাই অপরাধ প্রবণতার কারণ ব্যাখ্যা করা খুবই জটিল একটা কাজ। যদি সুস্থ সামাজিক পরিবেশে শিশু বড়ো হয় তবে তার মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কম হয়। কোনো শিশুর মধ্যে সদ্গুণ গুলির বিস্তার তার বাবা-মা-ই ঘটাতে পারে। যেমন— শিশু যদি দেখে তার বাবা-মা বড়োদের সঙ্গে এবং বাড়ির কাজের লোকের সাথে ভালো আচরণ করে তবে সেও সেটিই শিখবে। যদি এর বিপরীত আচরণ দেখে তবে সে তেমনটাই শেখে। যদি বাবা-মা বা বড়োরা কোনো শিশুর সামনে খারাপ গালিগালাজ করে তবে সে তা শুনতে শুনতে কোন না কোনো দিন না বুঝে হঠাৎ করে সেটি বলে ফেলে। তাই পরিবারের বিশেষ করে মা-বাবার উচিত শিশুর সামনে বুঝে-শুনে কথা বলা। শিক্ষক, শিক্ষিকা ও গুরুজনের সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত তা মায়ের ছোটো থেকেই শিশুদের শেখানো উচিত।

এর পাশাপাশি নানা জীবজন্তুর প্রতি কেমন আচরণ করা উচিত তাও শেখানো উচিত। যদি কোনো শিশু দেখে যে তার গুরুজনেরা পশু-পাখিদের উপর নির্দয় আচরণ করছে তাহলে শিশুও এমনই আচরণ করবে! তার মন থেকে মায়া মমতা প্রভৃতি গুণগুলি মুছে যেতে থাকে। বিশেষ করে আজকের যুগে প্রায়ই দেখা যায় অনেক মা-বাবা তাঁদের বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি যথেষ্ট উদাসীন। তাঁদের জন্য তাঁরা সময় দেননা, ঠিকমত যত্ন নেন না উপরন্তু কারণে অকারণে নানা খারাপ কথা বলে। এইসব আচরণ দেখে দেখে তা শিশুর মধ্যে প্রবেশ করে থাকে এবং সেও ক্রমশ তার বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে থাকে, ভবিষ্যতে তাদের আচরণেও আসে এসবের প্রভাব। সুতরাং অপরাধ প্রবণতার যে বীজ শিশুর মধ্যে সুপ্ত ছিল, মা-বাবার আচরণ তাকে জাগিয়ে তোলে।

বর্তমানে দেখা যায় আজকের দিনে একটি বা দুটি সন্তানের সংসারে মা-বাবা সন্তানকে অত্যন্ত বেশি আদর দিয়ে ফেলেন! প্রয়োজনের অতিরিক্ত নানা জিনিস যেমন—জামা-কাপড়, খেলনা ইত্যাদি কিনে দেন। শিশু যখন বড়ো হতে থাকে তার চাহিদাও তখন বাড়তে থাকে। বাবা-মা-এর সামর্থ্যের থেকেও বেশি দামি জিনিস কেনার জেদ বাড়তে থাকে। তখন না পেলে তার মধ্যে ক্ষোভের জন্ম নেয়।

তাই প্রথমেই মা-বাবাকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। আগে পুজো-পার্বণের সময় সকলের নতুন জামা জুতো হতো। তার আনন্দই ছিল আলাদা কিন্তু এখন শিশু সারা বছরই এত জামা জুতো পায় যে তারা আর নতুন করে পুজো পার্বণের জামা পাওয়ার আনন্দ পায় না। বাবা-মা যতক্ষণ দিতে পারবে ততক্ষণ শিশু আনন্দে থাকবে কিন্তু যদি কোনো কিছু দিতে না পারে তাহলে যে ক্ষুব্ধ হবে।

সুতরাং শিশুর সাধ্য অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে তোলার পিছনে পরিবারের যথেষ্ট হাত আছে। অত্যধিক স্নেহ শিশুকে মানুষ নয় অমানুষ করে তোলে। এ-ব্যাপারটা মাথায় রাখা জরুরি।

এ-প্রবণতাগুলি প্রতিকারে নানা ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। নানা রকম সামাজিক কাজকর্ম করতে অপরাধ-প্রবণ ছেলেমেয়েদের সুযোগ দিলে তারা ভালো হয়ে ওঠে। ছোটোরা বিভিন্ন রকম কুসংস্কার দেখে বড়োদের প্রশ্ন করে। তাতে বিরক্ত না হয়ে তার যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত।

সবশেষে একথা বলা যায় যে, এই যুগের মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, গুরুজন সকলকে সচেতন হতে হবে। শিশুদের প্রতি অধিক যত্নবান হতে হবে। বাবা-মায়েরা তাদের কর্মব্যস্ত জীবনে তাদের সন্তানদের জন্যও সময় দিতে হবে। শিশুদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে হবে। যাতে তারা যে কোনো সমস্যার কথা নির্দ্বিধায় বাবা মায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে।

শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যতের কান্ডারী। তাই তাদের প্রতি আমাদের সকলেরই অধিক যত্নশীল হতে হবে।

শিক্ষাদর্শ, মানবাত্মা কোথায় গেলে পাই
যান্ত্রিক শিক্ষায় ব্যস্ত সবাই
নীতি শিক্ষার নেই যে ঠাঁই।

হরিপদ সাহা

শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ক উপদেষ্টা, বালুরঘাট বি.এড. কলেজ

শিক্ষাক্ষেত্র, শিক্ষক সমাজ, ছাত্র সমাজ আজ শৃঙ্খলার অভাবে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। চারদিকে শুধু গেল গেল রব। অভিভাবক থেকে শুরু করে দেশের আপামর জন-সাধারণ আজ আতঙ্কগ্রস্ত তাদের সন্তানদের ভবিষ্যত নিয়ে। সবাই দিশেহারা, কিন্তু কেন? কেন এমন হল? এ অবস্থার জন্য দায়ী কে?

এত সব প্রশ্নের সহজ উত্তর হল—দায়ী আমরা সবাই;—অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক-সমাজ-রাজনীতি, অর্থনীতি-শিক্ষানীতি ও পরিকল্পনা।

নিত্য নতুন আইন প্রণয়নের দ্বারা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে হয়তো কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে কিন্তু মানুষের অন্তরটা অস্পৃশ্যই থেকে যায়। মানসিকতার উন্নতি না করে শুধুমাত্র বহিরাঙ্গের উন্নতি ঘটালে এমনটাই হতে বাধ্য। চারদিকে শুধু অস্থিরতা, অনাচার আর স্বেচ্ছাচারিতা।

আমাদের ছাত্র জীবনে শিক্ষক মশাইরা বলতেন —'তোমাদের বিদ্যালয় হ'ল মন্দিরের মতো। এ মন্দিরে দেবী সরস্বতী সদা বিরাজমান। এর পবিত্রতা রক্ষা করা তোমাদের প্রধান কর্তব্য'—আমরা ছাত্র-জীবনে শিক্ষক মশাইদের কথাগুলো সবসময়ের জন্য মনে রেখে আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতি চরম আনুগত্য প্রদর্শন করতাম নানা ক্ষেত্রে—যেমন খেলার মাঠে, পরীক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তঃ বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অঙ্গনে প্রিয় বিদ্যালয়ের পতাকাকে শীর্ষে তুলে ধরার জন্য কি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রয়াস তা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। নিজ বিদ্যালয়ের প্রতি এই যে মমত্ব বোধ তা কেমন করে সৃষ্টি হল? কি করে জাগলো এত প্রীতি, মমতা ও ভালোবাসা? এর পেছনে কাদের-ই বা অবদান ছিল?

তাঁদের মতো মানুষের আজ খুবই অভাব, নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আজকাল প্রায় দেখা যায় না কেন?

শুধু ছাত্রদের দোষ দিলে হবে না, ওর মনটাকে আমরা তৈরি করতে পারিনি। আমরা তো ওকে বোঝাতে পারিনি যে এই বিদ্যালয়ের বাড়ি-ঘর তোমার নিজের বাড়ির মতোই, এর আসবাবপত্র বিভিন্ন সাজ সরঞ্জাম বাড়ির মতোই সমানভাবে যত্ন নেবে।

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে অভিভাকদের দোষ দেওয়া যায় না—ওদের সন্তানকে ঘিরে উচ্চাশা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যাতে অনেক সময় হতাশার সৃষ্টি হয়। ওদের সন্তান জীবনের সব পরীক্ষাতেই প্রথম কয়েকজনের মধ্যে থাকুক সে জন্য চলছে নানা প্রচেষ্টা তা সে সোজা পথে কিংবা বাঁকা পথেই হোক। তারা চান না তাদের ছেলে-মেয়ে পঠন-পাঠনের বাইরে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে অংশ-গ্রহণ করুক। এর ফলে সহ-পাঠীদের সাথে দলগতভাবে সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন ক্রীড়াকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর থেকে

সফল অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না আবার বিদ্যালয়ের সাথে একাত্ম হতেও পারে না, সাথে সাথে দলগত উৎস থেকে সৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনেও ব্যর্থ হয়।

নীতিবোধই নৈতিক চরিত্র গঠনের ভিত্তি। বর্তমানে শ্রেণি-পাঠ্য বিষয়গুলি নৈতিক বিষয় নিয়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থেকে বিরত থাকতে দেখা যায়। এতে কিন্তু শিক্ষার্থী তাদের নীতি বোধকে জাগাতে ব্যর্থ হয়।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশঃ যন্ত্র নির্ভর হয়ে পড়ছে। কম্পিউটার কিংবা সমগোত্রিয় শিক্ষোপকরণে অভ্যস্ত শিক্ষার্থীও যন্ত্র চালনায় পটুত্ব অর্জনে বেশি মনযোগ দেয় এবং উৎসাহ বোধ করে। যার ফলে আরও বেশী মাত্রায় গৃহবন্দি হয়ে পড়ে।

আমরা ছাত্রজীবনে বিদ্যালয়ের ছুটির কিংবা ছোট ছোট ছুটির দিনগুলোতে খোলা মাঠে মাথার উপর মুক্ত আকাশকে সঙ্গী করে বন্ধুদের সাথে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, দৌড়, লাফালাফি নানা অনুশীলনে ব্যস্ত থাকতাম। ফলে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থতার কোন অভাব আমরা বোধ করিনি। আমাদের অভিভাবকরা এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি।

এখন দেখতে পাই—বিদ্যালয় থেকে ফিরেই অভিভাবকের তাড়ায় টিউশন না হয় কোচিং সেন্টারে ছুটতে হয় ছাত্রকে কোন রকমে পেটে কিছু দিয়ে কিংবা না দিয়ে—মানসিক ক্ষুধাকে বিসর্জন দিয়ে।

এতেই তৃপ্তি পান বর্তমান অভিভাবকগণ। এদের চাহিদা আরও, আরও, বেশী বেশী নম্বর। শিক্ষার্থীর অবস্থা এক্ষেত্রে ইঁদুর ছানার মতোই। পাছে বাবা-মা কিছু বলেন। মুখে কিন্তু না বললেও অন্তরে এক নিদারুণ বেদনা নিয়ে ধুকতে থাকে হতভাগ্য শিক্ষার্থী। ওদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা কেউ ভাবেনা। 'সর্বশিক্ষা মিশন' শিশুর বিদ্যালয়ে গমনকে উৎসাহ দিতে দেয়ালে দেয়ালে লিখছে—'চলো যাই একসাথে পাঠশালাতে, লিখতে পড়তে জানতে।' শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এরকম দেয়াল লিখন ও প্রচারে আসা উচিত বলে আমার মনে হয়—

'দল বেঁধে চলো মাঠে ফেলতে,
দেহ-মন আর চরিত্র গড়তে।
লেখাপড়ার সাথে সাথে,
মনের ক্ষুধাও মিটবে তাতে।'

সবাই বেশী বেশী নম্বর পাবে ধরে নিয়ে বলছি—তারপর উচ্চ-শিক্ষার্থে গৃহ ছাড়া, তারপর লোভনীয় চাকুরীর স্বার্থে দেশ ছাড়া। নিজের পরিবার সমাজ ও দেশের সেবার পরিবর্তে বিদেশ সেবা। এটা নিয়েই গর্বিত হন বর্তমান অভিভাবক বৃন্দ। অহঙ্কার করে বলেন—'আমার ছেলে স্টেটস্ এ আছে।' নয়তো সিডনী, কানাডা অথবা টোকিও কিংবা লন্ডনে। দেশের সম্পদ যে হতে পারতো সে আজ বিদেশের নানা উন্নয়ন মূলক কাজে লিপ্ত। বিদ্যালয়ের প্রতি তার মমত্ব বোধতো দূরের কথা, তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি মমত্ব এবং কর্তব্য বোধ সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন থেকেই যায়। দেশের কর্ণধার যাঁরা তাঁরা একটু ভাবলেন কি? এই সব মানবিক সম্পদকে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করা যায় কি না?

ছাত্রের মধ্যে আত্মিক বোধ জাগাতে হবে, এই বোধই শিক্ষার মাধুর্যকে বৃদ্ধি করে ছাত্রকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল করে। ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, সদাচার-কদাচার, নীতি-দুর্নীতি, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদির পার্থক্য ছাত্রের মনে গেঁথে দিতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষকই হবেন আদর্শ গুরু। সত্যি করে বলুন তো, আমরা কি সবাই প্রকৃত শিক্ষক হতে পেরেছি, যে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করব আমাদের প্রিয় ছাত্রদের? আমরা ছাত্রদের প্রকৃত বন্ধু হতে পেরেছি কিংবা বন্ধুর মতো আচরণ করেছি ওদের সাথে? ওরা কী চায় ওদের ভাবনা-চিন্তা এ সবের কি মর্যাদা দিয়েছি কখনও? একটু ভাবুন সবাই তারপর এগিয়ে চলুন প্রকৃত মানুষ গড়তে। অর্থোপার্জনের পেশা হিসাবে নয়—মহত্তম পেশা হিসাবে শিক্ষকতাকে গ্রহণ করে শিক্ষককে এগিয়ে

আসতে হবে ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অফুরন্ত ভান্ডার নিয়ে ছাত্রের নৈতিক চরিত্র গঠনের কাজে দেশের সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে। সদানন্দে মগ্ন থেকে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করবে তার আনন্দ সৃষ্টিকারী শিক্ষকের কাছে। এটাই আসল কথা। শিক্ষাকে শুধুমাত্র উপার্জনের লক্ষ্য হিসাবে দেখলে আমরা কখনই এগোতে পারবোনা, উচ্চ প্রতিভার অধিকার মানুষ গড়ার কারিগর যাঁরা আশা করি প্রচুর অর্থ কামাই এর উদ্দেশ্যকে পরিহার করে এগিয়ে চললে সমাজ ও দেশ এগোবে। এটা দেশ ও দশের গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

মাননীয় অভিভাবক বৃন্দের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ শুধুমাত্র নিজেদের চাপমুক্ত রাখতে কিংবা আরাম উপভোগ করা থেকে বিরত থেকে নিজেদের সন্তানদের একটু সঙ্গ দেবেন। ছোট্ট শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে পিতা-মাতা স্নেহ মমতা ভালোবাসা থেকে ওদের বঞ্চিত করবেন না। তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না বরং শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হবে। বাগানে যে চারা গাছ আপনি নিজে লাগিয়েছেন তার পরিচর্যাও আপনি নিজে করবেন দয়া করে মালির ভরসায় ছেড়ে দেবেন না। দেখবেন—শিশু চারাটি ক্রমশ বেড়ে উঠে ফুলে-ফুলে ভরে দিয়েছে আপনার বাগান।

শিক্ষা ও সমাজ

সুমনা দাস

বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

শিক্ষা বলতে শেখার দক্ষতা এবং মূল্যবোধ অর্জনের একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়। শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। শুধু শিশুরাই নয়, মানবসম্পন্ন শিক্ষা সব বয়সের ব্যক্তিদেরও উপকৃত করে। শিক্ষা একটি শক্তিশালী অস্ত্র যা একজন অনুৎপাদনশীল ব্যক্তিকে সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্যে পরিণত করতে পারে।

শিক্ষা একজন ব্যক্তি, সমাজ এবং সেইসাথে জাতির সামগ্রিক বৃদ্ধি নিয়ে আসে, বিভিন্ন প্যারামিটারে। ব্যক্তিগত স্তরে, এটি একটি শিশুকে শিক্ষিত এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করে বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করে তোলে। একজন শিক্ষিত শিশু বা একজন প্রাপ্তবয়স্কের সেই পথে চলার জন্য বুদ্ধি এবং সাহসের জন্য একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে।

তদুপরি, একজন শিক্ষিত ব্যক্তি লাভজনকভাবে নিযুক্ত হন বা যে কোনোও ধরনের স্ব-কর্মসংস্থানে জড়িত থাকেন, যার ফলে তার পরিবারে আর্থিক উন্নতি ঘটে। এই ধরনের সংখ্যাগরিষ্ট, শিক্ষিত এবং ভালো করার মতো পরিবারগুলি একটি প্রগতিশীল সমাজের ভিত্তি চিহ্নিত করে। যা প্রতিটি দিন কাটানোর সাথে সাথে ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষিত এবং উৎপাদনশীল নাগরিকরা যে কোনো দেশের একটি মূল্যবান সম্পদ এবং এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবৃত্তিতে ব্যাপক অবদান রাখে। একটি মানবসম্পন্ন এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা একটি জাতির বৃদ্ধিতে সাহায্য করে—নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য হ্রাস করে এবং সামগ্রিক সম্প্রীতি সৃষ্টি করে।

সমাজের সুস্থতা অনেকাংশে শিক্ষার সুযোগের প্রাপ্যতা এবং মানের উপর নির্ভর করে। সে সমাজ শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দেয় এবং লিঙ্গভিত্তিক বা অন্যান্য ধরনের বৈষম্য ছাড়াই শিক্ষাকে তার শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে কোনো কসরত রাখে না, সে সমাজ একটি সুস্থ, সুখী এবং উৎপাদনশীল সমাজে পরিণত হবে। এমন সমাজ জাতির মুকুট মণির মতো।

এছাড়াও, এটা বললে ভুল হবে না যে একটি জাতির প্রকৃত উন্নতি তার সমাজ থেকেই শুরু হয়, অন্যদিকে একটি সমাজের অগ্রগতি নির্ভর করে তার শিক্ষার স্তর এবং সহজলভ্যতার উপর। অতএব, শিক্ষা একটি সভ্য সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং পূর্ববর্তীকে যথাযথ বিশ্বাস না দিলে পরবর্তীটি অগ্রগতি করতে পারে না।

শিক্ষা একটি সমাজ ও সামগ্রিকভাবে জাতি গঠনের সর্বাগ্রে পূর্বশর্ত। শিক্ষা ব্যতীত কেবলমাত্র ব্যাপক নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, এবং একটি ভাঙ্গা, ভঙ্গুর ও বিপর্যস্ত সমাজ থাকবে। এমন সমাজকে পেছনে রেখে একটি জাতি উন্নতি করতে পারে না। অতএব, শিক্ষা হল আলো যা একটি অন্ধকারে ও অনুৎপাদনশীল সমাজকে একটি উজ্জ্বল ও ফলপ্রসূ সমাজে পরিণত করে। জাতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

নারীশিক্ষা :
ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার-আধুনিকতা

চাঁদ কুমার দাস

সহ-অধ্যাপক, (বালুরঘাট বি.এড. কলেজ)

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?
... ...
শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ?"

'সবলা' কবিতায় নারীর আত্ম-অধিকার ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের বিষয়ে যে প্রশ্ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা আজও প্রাসঙ্গিক। নারী শিক্ষার অতীত ঐতিহ্য নানা পথ অতিক্রম করে, নানাবিধ উত্তরাধিকারকে আপন অবয়বে ধারণ করে আধুনিকতাকে স্পর্শ করেছে। নারী মুক্তি, নারী-শিক্ষা, নারীদের সম অধিকারের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। বৈদিক যুগে, সমাজে নারীর স্থান ছিল অতি উচ্চে। সে যুগে শিক্ষায় নারী ও পুরুষে যে ভেদ ছিল না, তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। নারীর বেদে অধিকার ছিল এবং তাঁরা যজ্ঞেও অংশগ্রহণ করতে পারতেন। তাঁরাও গুরুগৃহে বেদ পাঠ করতেন। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে, ছাত্রী জীবন শেষ না করলে কুমারীদের বিবাহের অধিকার জন্মাতো না। বৈদিকযুগে নারীরা শুধুই যে শিক্ষা গ্রহণ করতেন তাই নয়, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মন্ত্রদ্রষ্টাও ছিলেন। রামায়ণে কৌশল্যা ও তারাকে মন্ত্রবিদ্ বলা হয়েছে। মহাভারতে দ্রৌপদীকে পণ্ডিতা বলা হয়েছে। প্রাচীনযুগে নারীরা অনেক সময় ব্রহ্মসম্পর্কীয় গূঢ় আলোচনায় বা বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভার নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনক সভায়, গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে ব্রহ্ম সম্পর্কে বিতর্ক বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতীয় প্রাচীন সমাজে নারীরা অধ্যাপনার দায়িত্বও গ্রহণ করতেন। পাণিনি, আচার্যা, উপাধ্যায় শব্দের দ্বারা আচার্যানী ও উপাধ্যায়ানী অর্থাৎ, আচার্যের স্ত্রী, এই দুটি শব্দ থেকে পৃথক করে, নারী-অধ্যাপিকাকে বুঝিয়েছেন। প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে উপনিষদ ও মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত নারীদের শিক্ষার অধিকারে কোন ব্যাঘ্যাত ঘটেনি। স্মৃতির যুগে প্রামাণ্য শিক্ষাব্যবস্থার কাল থেকে, ধীরে ধীরে নারীদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতে থাকে। এই সময় উপনয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর, বাল্য বিবাহের প্রবর্তন হলে নারীরা ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে আবদ্ধ হয়ে পড়তে থাকেন। মনুসংহিতায় দেখি, বিধান দেওয়া হয়েছে নারীরা বাল্যের পিতা, যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকবে। মনু আরো বলেছেন, নারীদের বিবাহ বেদ অধ্যয়নের সমান ; স্বামীর সেবা করা, আশ্রমে পাঠ করার সমান এবং গৃহকার্য করাই তাদের সান্ধ্যবন্দনার সমান। মোঘলযুগে কয়েকজন বিদুষী মহিলা সাহিত্যচর্চা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সাধারণ অবস্থা ছিল খুবই খারাপ।

উডের ডেসপ্যাচের আগে পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেশে নারীশিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে কোন রকম দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। বিদেশী বণিকদের আগমন

ও উড্-এর ডেসপ্যাচের প্রকাশকালের মধ্যবর্তী সময়ে দেশে নারী শিক্ষার যেটুকু অগ্রগতি হয়েছিল, তা মিশনারী ও বেসরকারী শিক্ষাব্রতীদের প্রচেষ্টায় এবং দানে। অ্যাডামের রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁর সময়ে (1835-37) নারী শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথাগত শিক্ষাদানের জন্য 1918 সালে রেভারেন্ড মে চুঁচুড়ায় প্রথম একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু বিদ্যালয়টি বেশী দিন চালানো সম্ভব হয়নি। 1819 সালে কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 1890 সালে ব্যাপটিস্ট্ মিশনের অনুরোধ ইংরেজ মহিলারা, দেশে নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির নাম ছিল, ‘‘The female juvenile society for the establishment and support of Bengal Female School.’’ 1829 সালে দেখা যায়, এই সমিতি, অন্ততঃপক্ষে, কুড়িটি বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই সমিতির কাজে সাহায্য করার জন্য লন্ডনের ‘‘British and Foreign School Society’’, 1821 সালে মিস্ এস্ কুক-কে ভারতে পাঠান। আমাদের দেশে নারীশিক্ষা বিস্তারে মিস্ কুক-এর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলাদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারে কিছু শিক্ষাব্রতী বাঙালিও এই সময় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। উত্তরপাড়া, বারাসত, যশোর প্রভৃতি স্থানে, এই সব বিদ্যোৎসাহীদের প্রচেষ্টায় মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

1848 সালে বেথুন সাহেব বড়লাটের পরিষদের আইন সদস্য হিসেবে এদেশে আসেন। তার প্রচেষ্টায় 1944 সালে 21 জন ছাত্রী নিয়ে ‘‘Calcutta female school’’ স্থাপিত হয়। বেথুন সাহেব এই বিদ্যালয়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দশ হাজার পাউন্ড দান করেন। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য পাঁচ বিঘা জমি ও দশ হাজার টাকা দান করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ‘‘Calcutta female school’ প্রতিষ্ঠা থেকেই বাংলার নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর, তাঁর স্মৃতিতে এই বিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে তার নাম যুক্ত হয়। পরে 1879 সালে এই বিদ্যালয়, কলেজে রূপান্তরিত হয়, যা বর্তমানে বেথুন কলেজ নামে পরিচিত। বাংলাদেশের মতো মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে মিশনারী মহিলাদের উদ্যোগে ও উৎসাহে কিছু মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 1821 সালে ‘‘চার্চ মিশনারী সোসাইটি’’ মাদ্রাজে প্রথম মেয়েদের স্কুল স্থাপন করেন। 1850 সালে দেখা যায়, মিশনারীরা মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে সাতটি মেয়েদের বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমেরিকান মিশনারী সম্প্রদায় বোম্বাই প্রদেশে 1824 সালে প্রথম মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নারীশিক্ষার বিরোধী ছিল। এই কারণে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপকতার নীতির অজুহাতে সরকার নারীশিক্ষার জন্য কোন সাহায্য দেওয়া থেকে বিরত ছিল। এ সত্ত্বেও মিশনারীদের ও কিছু সহৃদয় ইংরেজ এবং বিদ্যোৎসাহী ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় দেশে প্রথাগত নারী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। পূর্ববর্তী অবস্থার বিচারে, ঐ প্রচেষ্টা খুব নিরাশাজনক ছিল, একথা বলা যায় না। কারণ 1854 সাল পর্যন্ত এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, তখন মাদ্রাজে 25টি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 8000 জন ছাত্রী পড়াশুনা করতো ; বোম্বাই প্রদেশে এই সময় 65টি বিদ্যালয়ে 6500 জন ছাত্রী পড়াশুনা করতো এবং বাংলায় 288টি বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় 6869 জন। এ ছাড়া উত্তর-পশ্চিম দেশে মিশনারীদের পরিচালিত দশটি বিদ্যালয়ে 386 জন ছাত্রী পড়াশুনা করতো।

1858 সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় 40টি অবৈজ্ঞানিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এই সময়ে ভারতে তিনটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই) স্থাপিত হলেও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অধিকার লাভ করতে আরো 20 বছর লেগেছিল। 1877 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং 1883 সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার বাধা প্রত্যাহার করে। চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু ভারতে প্রথম ভারতীয় মহিলা গ্রাজুয়েট হন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিরোধিতা না থাকলেও সরকার নারী শিক্ষার ব্যাপারে যে স্বতঃস্বতভাবে এগিয়ে এসেছিলেন একথা বলা যায় না। এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে সরকারের প্রচ্ছন্ন নিষ্ক্রিয়তাই প্রমাণিত হয়। এই সময় নারী শিক্ষার জন্য কলেজ ছিল 12টি যার মধ্যে একটি মাত্র সরকার পরিচালিত; 442টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র 86টি বিদ্যালয় সরকার পরিচালিত; 5605টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র 172টি বিদ্যালয় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে নারী শিক্ষার অগ্রগতি মুখ্যতঃ বেসরকারী প্রচেষ্টাতেই হয়েছিল। তবে বিংশ শতাব্দীতে নারী শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে সরকার পক্ষে সক্রিয়তা একটু বেশী লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে বেসরকারী উৎসাহও বৃদ্ধি পায়। এই সময়, 1904 সালে এ্যানি বেসান্ত বেনারসে সেন্ট্রাল হিন্দু গার্লস কলেজ স্থাপন করেন।

1916 সালে মেয়েদের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য দিল্লীতে লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। ঐ বছরই পুণায় অধ্যাপক কার্ভে প্রতিষ্ঠা করেন ইন্ডিয়ান উইমেনস ইউনিভার্সিটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের উপযোগী পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বে নারী শিক্ষা সম্পর্কে যে সামাজিক বাধা ছিল, বিংশ শতাব্দীতে এসে, সেই সনাতনপন্থী গোড়া হিন্দু-সমাজে নারী শিক্ষা সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। সরকার থেকেও বেসরকারী নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। সরকারী অনুকূল্যের দরুন এবং নারী শিক্ষা সম্পর্কে জাতীয় চেতনা জাগ্রত হওয়ার দরুন, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী দশকে ভারতে নারী শিক্ষার প্রসার তুলনামূলকভাবে বেশী হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠরত মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল 3,56,413, সেই সংখ্যা বেড়ে 1947 সালে হয় 32,14,860। আনুপাতিক হারে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তবে স্বাধীনতার পূর্বে নারী শিক্ষার যে প্রসার ঘটেছিল, তা প্রধানতঃ শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামীণ ভারতের অগণিত নারী তখনও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। শহরে মেয়েদের পঠন-পাঠনের জন্য বেসরকারী ও সরকারী প্রচেষ্টায় যেভাবে বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল, গ্রামাঞ্চলে তা হয়নি। সরকারও গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু করেননি। গান্ধীজী, স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তার প্রভাবে যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছিল, তার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সহ-শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই কিছু কিছু পড়াশুনার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু, পৃথক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে তাদের জন্য ছিল না।

স্বাধীনতার পরে গঠিত জাতীয় সরকার দেশের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অসম ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। স্বাধীনতার পরে পরেই ডঃ সর্বপল্লী

রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়, সেই কমিশন তাঁদের প্রতিবেদনে সরকারকে নারীশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন করেন এবং কতকগুলি কার্যকরী ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1952-53) বা মুদালিয়র কমিশনও সরকারকে মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দেন এবং যে সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেই সব বিদ্যালয় ছাত্রী এবং শিক্ষিকাদের সুযোগ বৃদ্ধির পরামর্শ দেন। শিক্ষা কমিশনগুলির এই সুপারিশগুলি আংশিকভাবে হলেও সরকার কার্যকরী করার চেষ্টা করেন। তার ফলে, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রথম দশ বছরে নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রীর সংখ্যা দুইই দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখা যায়, ঐ সময়ে যে হারে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই হারে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ, সমস্যা দেখা দিল, সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশে নারীশিক্ষার উন্নতি ঘটেনি, তাই নারী শিক্ষার সামগ্রিক বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 1954 সালে শ্রীমতী দুর্গাবাই দেশমুখকে সভানেত্রী করে একটি কমিটি গঠন করেন (National Committee on Women's Education)। নারীশিক্ষার অতীত ইতিহাস ও বর্তমান সমস্যাদি পর্যালোচনা করে, কমিটি নারী- শিক্ষা সম্পর্কে তাদের সুপারিশ 1959 সালে সরকারের কাছে পেশ করেন। অগ্রগতি আনুপাতিক হারে হয়নি। কমিটির সব সুপারিশগুলি প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী করা না হলেও ভারত সরকার 1959 সালে জাতীয় নারীশিক্ষা পর্ষৎ (National Council for Women's Education) গঠন করেন। এই পর্ষৎ এর প্রধান হলেন শ্রীমতী দুর্গাবাই দেশমুখ এবং এর সদস্য সংখ্যা হল 28। এছাড়া, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকেও নারীশিক্ষা সংক্রান্ত একটি পৃথক বিভাগ (unit) স্থাপন করা হল। নারীশিক্ষার সমস্যাদি বিশ্লেষণ ও ঐ সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ''নারী শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান'' (National Institute for Women's Education) নামে একটি সংস্থাও স্থাপন করা হল। দুর্গাবাই কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করার পরেও দেশের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয়নি। 1958 থেকে 1961-র মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র 3%। অন্যদিকে, 1961-62 সালে যেখানে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার শতকরা 81 ভাগ ছিল ছাত্র, সেখানে ছাত্রী সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র 19 ভাগ। অর্থাৎ, নতুন নতুন বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেও অবস্থার কোন বিশেষ উন্নতি হয়নি।

গ্রামাঞ্চলে এবং অন্যান্য অনগ্রসর এলাকায়, নারীশিক্ষার প্রতি সাধারণ নাগরিকগণের উদাসীনতার কারণ নির্ণয় করে, জনসাধারণের সহযোগিতায় নারীশিক্ষার প্রসার কিভাবে ঘটানো যায়, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করার জন্য। জাতীয় নারী শিক্ষা পর্ষৎ 1963 সালে, তদানীন্তন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভক্তবৎসলম-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিলেন। দেশে নারীশিক্ষার বিস্তার করতে হলে, জনসাধারণের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। আর এই সহযোগিতা শিক্ষার সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে পেতে হবে। তাই বেসরকারী প্রচেষ্টায় নতুন নতুন নারীশিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দিলে, এই সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হবে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিকাদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তাতে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিকার অভাব দূর হবে। এ ছাড়া, শিক্ষিকার অভাব দূর করার জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করতে

হবে। নারীশিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সেমিনার, সম্মেলন, বেতার প্রচার ইত্যাদির মতো জনসংযোগমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে এ-বিষয়ে জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান-গুলির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। মাধ্যমিক স্তরে মেয়েরা যাতে লেখাপড়ার সুযোগ পায়, তার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। কমিটি বলেছেন, প্রতি 5 মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একটি মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে। তা ছাড়া, দুপুরে আহারেরও ব্যবস্থা করতে হবে। অনগ্রসর অঞ্চলে ছাত্রীদের বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব মেয়েরা বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পূর্বেই সংসার জীবনে প্রবেশ করেছে, তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। শ্রীভক্তবৎসলম্ কমিটির এই সুপারিশ-গুলি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ (C.A.B.E.) এবং জাতীয় নারী শিক্ষা পর্ষদ গ্রহণ করেন এবং ইতিমধ্যে গঠিত ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (Indian Education Commission, 1964-66) বিবেচনার জন্য স্থাপন করেন।

কমিশনের এই পরামর্শ অনুযায়ী 1968 সালে জাতীয় শিক্ষানীতিতে নারী শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করার অঙ্গীকার করা হয়। শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে—‘‘The education of girls should receive emphasis, only on grounds of social justice, but also because it accelerates social transformation.’’

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ক্রমে এবং 1968 সালের জাতীয় শিক্ষানীতির (National policy on Education, 1968) কার্যকরী করার শত কয়েক বছরে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ (C.A.B.E.), নারী শিক্ষার অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য এবং এদিকে সাধারণ নাগরিকদের উৎসাহিত করার জন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে পূর্ণ সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করেন। কোন কোন রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরে নারীশিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে অবৈতনিক করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও (U.G.C.) মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য নিঃশর্ত অনুদানের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন রাজ্যে, রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে ও কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় মেয়েদের পলিটেকনিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার সাধারণ ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু, এই সব বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেখা যায়, মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থীদের সংখ্যার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থেকে গেছে। 1978-79 সালের এক জাতীয় সীমাক্ষায় (National Survey) দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীদের মাত্র শতকরা 40 ভাগ মেয়ে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মোট শিক্ষার্থীর শতকরা মাত্র 33 ভাগ ছাত্রী এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের শতকরা 28 ভাগ ছাত্রী। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন, কিন্তু শতকরা হিসাবে সাম্য আসতে এখনো অনেকটা পথ পেরোনো বাকি।

1986 সালের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি (New Education Policy, 1986) রচনার পূর্বে তাই নারীশিক্ষার মূল ত্রুটিগুলি নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং কি করা যেতে পারে, সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে যে ব্যবস্থাদি গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল, সেগুলি হল নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় (Wastage) সব থেকে বেশী। তাই নারীশিক্ষার প্রসার ঘটাতে হলে মেয়েরা যাতে সম্পূর্ণ

শিক্ষাকাল বিদ্যালয়ে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীশিক্ষার পাঠ্যক্রমকে সামাজিক চাহিদার উপযোগী করে এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদর্শ ভারতীয় নারীর মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। সমাজের মধ্যে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগানোর জন্য বিভিন্ন পাঠ্যসূচিতে নারী বিষয়ক শিক্ষাকে (Women studies) একটি পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

নারীশিক্ষা সম্পর্কে উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যগুলির সঙ্গে, বিশেষজ্ঞদের মতামত বিচার করার পর 1986 সালে যে জাতীয় শিক্ষানীতি গঠন করা হয়, তাতে নারীশিক্ষার অগ্রগতিকে দ্রুততর করার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। শিক্ষানীতিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে—"In order to neutralize the accumulated distortions of the past, there will be a well–conceived edge in favour of women." এই শিক্ষানীতিতে আরো বলা হয়েছে, শিক্ষাকে নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু নতুন শিক্ষানীতি প্রকাশের পর ভারতের সামাজিক-নৈতিক কাঠামোর মধ্যে এমন কিছু পরিবর্তন আসে, যার চাপে উল্লিখিতগুলিকে সার্বিকভাবে কার্যকরী করা আজও সম্ভব হয়নি। তবুও কম তবে পরবর্তীকালে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে ভারতে নারীশিক্ষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি যথেষ্ট প্রমাণিত। 1991 সালের জন-সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে 30.3% এবং শহরাঞ্চলে এই হার 63.9%। ইতিমধ্যে, এই হার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পরবর্তী জনসমীক্ষা থেকে জানা সম্ভব হবে। তবে ভারতে নারী-শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সন্তুষ্টির কোন কারণ নাই। এখনও বহু সমস্যা বর্তমান, যেগুলির—মনের উপর দেশের নারীশিক্ষার অগ্রগতি নির্ভর করছে। তবে বর্তমানে সামাজিক প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা প্রত্যক্ষভাবে নারী শিক্ষা প্রসারে শিক্ষর্থীদের মনে প্রেষণা সঞ্চার করবে। কারণ, সামাজিক দায়িত্বগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, উপযুক্ত শিক্ষা ও বিশেষ দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মহিলারাই অনুভব করবেন।

নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য শুধু কেন্দ্র-রাজ্য বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াসই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন পরিবারের মধ্যে থেকেই নারী শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা গড়ে তোলা। এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ নিতে হবে অভিভাবকদের। প্রত্যেক পরিবারের পুরুষের পাশাপাশি নারীর শিক্ষার জন্য শৈশব থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একেবারে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত এবং নারীর স্বাতন্ত্র্য লাভ পর্যন্ত বা শিক্ষান্তে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সময় পর্যন্ত অভিভাবক, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও দেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসুন আমরা এ-বিষয়ে সচেতন হই এবং নারী শিক্ষার সকল প্রয়াসকে সার্থক করে তুলি।

একালের আয়নায় শিক্ষকতা

বিনয় কুমার গোস্বামী

বিভাগীয় প্রধান (ডি.এল.এড. কোর্স)

শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষকতা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। শিক্ষক বিহীন শিক্ষা অকল্পনীয়। যদিও তার রুপ বিভিন্ন হতে পারে। শিক্ষা যদি আচরণ পরিবর্তনের উপায় হয়, তাহলে শিক্ষক সেই পরিবর্তনের কাণ্ডারী। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, কে শিক্ষক? যিনি শিক্ষাদাতা তিনিই শিক্ষক। অধ্যাপক সুকুমার সেনের ভাষায় :

শি = শিষ্টাচার।
ক্ষ = ক্ষমা।
ক = কর্তব্য।

অর্থাৎ যিনি আচরণে শিষ্টাচারী, ক্ষমায় অকুতভয় এবং কর্তব্যে অবিচল জ্ঞানী-পুরুষই শিক্ষক। শিক্ষক ও শিক্ষকতা শব্দ দুটি গুরুত্ব অপরিসীম। পূর্বে শিক্ষকতা অনেক বেশী গরিমা সমৃদ্ধ ছিল। এমন কী সাম্প্রতিক অতীতেও, বিশেষভাবে গতশতাব্দীর শেষ তিন/চার দশকেও শিক্ষকেরা সমাজে বিশেষ সম্মানীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিখ্যাত ধ্রুপদি গ্রন্থ ''রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ''-এ পাওয়া যায় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি সমাজে বাঙালি পণ্ডিতদের বিশেষ কদর ছিল। তাদের পণ্ডিত, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতার অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। মূলতঃ শিক্ষকতার মানের অবনতি, ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রমঅবনতি, দেশখণ্ডিত জনিত সমস্যার ফলে শিক্ষা ও শিক্ষণ জগতে কালবেলা শুরু হয়। মূল্যবোধজনিত অবক্ষয়, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ধ্বংস, রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা, সর্বপোরি দায়বদ্ধতার অভাব অন্যান্য পেশার মতো শিক্ষকতাও কুপ্রভাবে প্রভাবিত। প্রধানত বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকেই শিক্ষকতা সেবার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করে।

শিক্ষকের কাজ শিক্ষণ। সহজ ভাষায় শিক্ষণ হল : শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পাঠ্যক্রমের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যোগফল। যার প্রধান গন্তব্য হল শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে শিখরে পৌঁছানো। শিক্ষকের মানসিক গঠন, তার পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি, কৌশল, নিজস্ব শিক্ষণ দক্ষতা প্রভৃতির ফলাফলের উপরেই তার শিক্ষকতা মান নির্ধারিত হয় এবং তার শিক্ষণ কতটা স্বতঃস্ফূর্ত (Dynamic) ও নির্ণায়ক (Remedial) হবে, তা নির্ভর করে, সময়, কাল, যুগ, দেশ ও পাত্র নির্বিশেষে।

সেবা না পেশা?

অপরদিকে সেকাল ও একালের শিক্ষকতার অন্যতম নির্ণায়ক হল, পেশাটি সেবামূলক, না এটি অন্যতম একটি পেশামাত্র। আদর্শগত দিক থেকে শিক্ষকতা কোন পেশা নয়—এটি একটি মহান ব্রত। এই বাক্যটি সর্ব যুগে সব দেশেই সত্য। ঋষি অরবিন্দের ভাষায় এই ব্রতের মাধ্যমেই শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটান। প্রকৃতপক্ষে জনক ও জননীর মতো শিক্ষকের স্থান তার সন্তানসম শিক্ষার্থীদের মাঝে। সেই শিক্ষকের আদর্শই ভবিষ্যতে তার শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রবাহিত হয়। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিক্ষকতা একটি সুমহান পেশা। তারাই মানুষ তৈরির প্রযুক্তিযুক্ত কারিগর। মাননীয় শিক্ষগণকেই দেশ, জাতি বা সমাজের ভাবী নাগরিকদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, দেশের

জন্য আত্মত্যাগের পবিত্রমন্ত্রে দীক্ষা দিতে হয়। বর্তমানে একজন পেশাদার শিক্ষক তার শিক্ষাদান পদ্ধতি, কৌশল, প্রেরণা, প্রেষণা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়বদ্ধতার অস্ত্রে বলীয়ান হয়েই জীবন ও জীবিকার তাগিদেই শিক্ষকতাকে পেশাদারি দক্ষতার চরমে পৌঁছে দেন।

অতিসম্প্রতি শিক্ষা ও শিক্ষকতায় এক অতি-বিপ্লবীয় পরিবর্তন সূচিত হওয়ার ফলেই নানা জটিলতার সূত্রপাত। এর উপর সমাজে শিক্ষকের অবস্থান সর্বাধিক স্পর্শকাতর হওয়ায় পরিস্থিতি ক্রমশঃ অধিকতর জটিল হচ্ছে। গত শতকের আট বা নয়ের দশকেও পরিস্থিতি বর্তমান স্তরে পৌঁছায়নি। শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতাগুলি নিয়েই অনবরত চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছিল। কিছুকাল পূর্বেও বিশেষ কয়েকটি দক্ষতা শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতার মাপকাঠি ধরা হত। যেমন : একজন দক্ষ শিক্ষক হলেন তিনি যিনি শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত দক্ষতাগুলি সার্থক প্রয়োগ করবেন। সেগুলি হল :

(a) Create a Classroom situation first with Analogy ;

(b) A powerful voice ;

(c) Student's active participation,

(d) Classroom organization & class-room management ;

(e) Use of blackboard ;

(f) Time management ;

(g) Use of feedback ; etc.

কিন্তু সমস্যা হল আজও শিক্ষকতার নতুন নতুন পদ্ধতি, কৌশল, দৃষ্টিভঙ্গি (Approach) দক্ষতার সংযোজন হয়েই চলেছে। এ যেন একজন সমর সেনাপতির যুদ্ধযাত্রা। একজন শিক্ষককে এখন যতবেশী সম্ভব নানাবিধ অস্ত্রসস্ত্রে (পদ্ধতি, কৌশল, ইত্যাদি) সজ্জিত হয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রেরণ করা হচ্ছে। শিক্ষণ ও শিখন দুরস্থ, শেষে না মুষিকের পর্বতে প্রবেশ না হয়। এখন শুধু মাত্র গুরুগম্ভীর জ্ঞানভাণ্ডার সহকারে আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা নয়, যতদিন যাচ্ছে শিক্ষণের Method বা Pedagogy ব্যতিত দক্ষতার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটছে। নীচের চিত্রের মাধ্যমে তার কিছু নমুনা পাওয়া যেতে পারে—

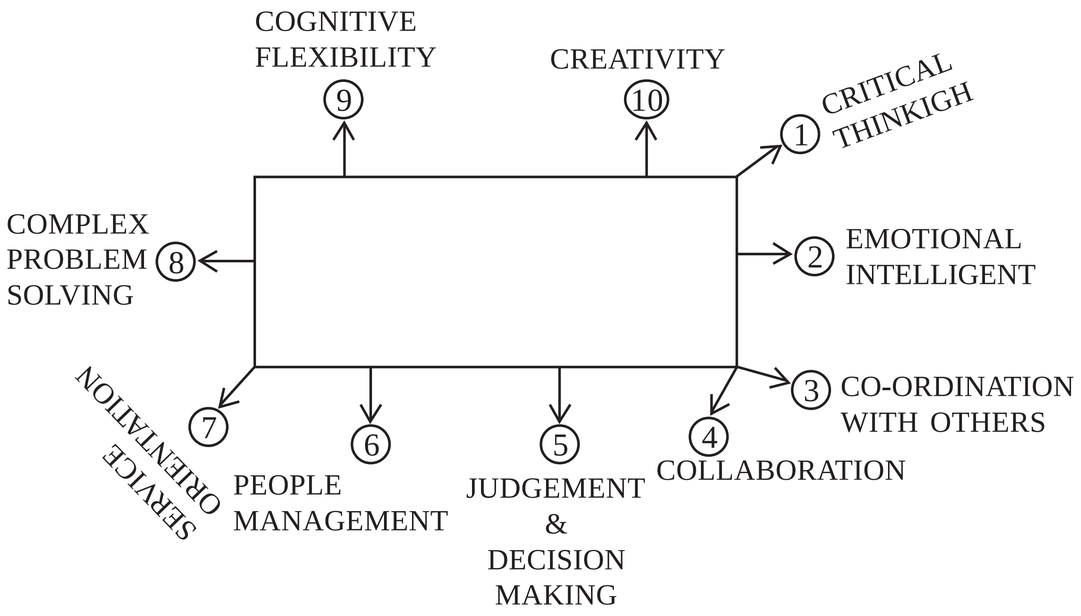

● **সাম্প্রতিক শিক্ষণ : আধুনিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি :**

একথা অনস্বীকার্য শিক্ষকতার পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরণ সাবেক শিক্ষকতার ধারার থেকে গভীর পার্থক্যের সূচনা করেছে। গতানুগতিক পদ্ধতি যেমন —গল্পবলা, নাট্যরূপায়ণ, আলোচনা পদ্ধতি থেকে শুরু করে Observation, Discovery, Local Field Study, Demonstation, Problem Solving, Project ইত্যাদি পদ্ধতিগুলি বহুল চর্চিত। তবে, সার্থক ও কার্যকরি শ্রেণিশিক্ষণে Local Field Study ও Demonstration পদ্ধতি দুটি সমসাময়িক শিক্ষক সমাজে খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু যথার্থ আধুনিকতম শিক্ষণ পদ্ধতি বলতে যা বোঝান হয় তার কিছু নমুনা ও তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

● **আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :**

প্রথমে আসা যাক আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি কাকে বলে—সেই বিষয়ে। খুব সহজ ভাবে বললে বলা যায়, পরীক্ষায় পাশ করানোর শিক্ষণের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের যে পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে নিজেদের আচরণকে অধিকতর বুদ্ধিদীপ্ত আচরণে (intellect behaviour) পরিবর্তন করতে সক্ষম হন, তাকেই আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics) গুলি হল :

(1) Learner Centred : শিক্ষার্থীরা শ্রেণির পঠন-পাঠনে যখন গুরুত্বপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং শ্রেণির পঠন-পাঠন (interaction)-এ BST পদ্ধতি (Basic Science & Technology) প্রয়োগে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে, তাকেই Learner Centred শিক্ষণ বলে। শিক্ষক এখানে একজন আদর্শ Guide মাত্র।

(2) Task Based or Activity Based : শিক্ষক এখানে BST পদ্ধতির সার্থক পরিচালক। এখানে Activity হল Task। যেহেতু সক্রিয়তাই এখানে প্রধান, সেহেতু শ্রেণির পঠন-পাঠন সম্পূর্ণভাবে Task-Based.

(3) Resource Based : যে-সব শিক্ষক BST শিক্ষক হবেন, তারা অবশ্যই কারিগরী সম্পদশীল সম্পন্ন। তারা পঠনীয় বিষয় সংগ্রহ ও বিতরণ করবেন। এই সম্পদগুলি অবশ্যই স্কুল পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। শিক্ষার্থীরাও সম্পদ সংগ্রহে অংশ নিতে পারে।

(4) Interactive in Nature : আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি অবশ্যই সহযোগিতাপূর্ণ বা interactive হবে। শিক্ষক এখানে তার শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে পারস্পরিক মত বিনিময় করে অভ্যন্তরীণ সহযোগিতা সম্পন্ন করেন।

(5) Integrative in Nature : সমন্বয়ী মনোভাব আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন বিষয়, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(6) Peer Collaboration : একালের শিক্ষণ পদ্ধতি Peer Reading থেকে শুরু করে Peer Teaching পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে অনুশীলন করা এবং বাস্তবে শ্রেণি শিক্ষণে প্রয়োগ করা হয়। আবার সাম্প্রতিতম শিক্ষণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে বহুল ব্যবহৃত ও চর্চিত পদ্ধতিগুলি হল :

(i) Collaborative Learning method ;
(ii) Flipped Classroom method ;
(iii) Self Learning method ;
(iv) Spaced Learning method ;
(v) Gamification ;
(vi) VAK (Visual-Audio-Kinesthetic) method ;
(vii) Crossover Learning method ; ইত্যাদি।

কিন্তু এই পদ্ধতিগুলি অধিকতর নতুন ও সাম্প্রতিক। এর চর্চাও খুবই সীমিত। যা আজও Traditional Teaching Method গুলিই অধিকাংশ শিক্ষকগণ ব্যবহার করে থাকেন। গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতি যতই পুরানো হোক এখনও এই পদ্ধতিগুলিই সমান জনপ্রিয়। কারণ—

(ক) শ্রেণি-শিক্ষণ (Class-teaching) এখনও শিক্ষককেন্দ্রিক।

(খ) চক-টক (Chalk-Talk) পদ্ধতি এখনও সমান জনপ্রিয়।

(গ) শিক্ষকগণ এখনও বিশুদ্ধ জ্ঞান বিতরণকারী (Knowledge dispensers), Facilitator নন।

(ঘ) প্রচলিত শিক্ষাব্যাবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত শ্রেণি-শিক্ষণ (Hard Controlled Classroom Teaching) প্রচলিত, যেখানে সহজে জ্ঞান বিতরণ করা সম্ভব।

(ঙ) কোন বিদ্যালয়েই প্রকল্প, আবিষ্কার, সমস্যা-সমাধান ইত্যাদি কোন পদ্ধতি, এমনকি Group Learning, Group Teaching, Peer Teaching দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত কোন মহল আগ্রহী নয়।

তাই শিক্ষণে আধুনিক পদ্ধতির এখনও বিশবাঁও জলেই রয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও বাউল :
‘আমি’র অহং পরিত্যাজ্য, বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে একাত্মবোধ

ড. সৌরভ মণ্ডল

সহ-অধ্যাপক, (বালুরঘাট বি.এড. কলেজ)

‘‘আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।’’

—বাউলের এই ‘মনের মানুষ’কে পেয়েই রবীন্দ্রনাথ যেন মানবধর্মে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন। অস্তিত্বের চরম সত্য হল এই যে ঈশ্বর নয়, ব্রহ্ম নয়, মানব ব্রহ্ম। উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে পরমাত্মা। শিলাইদহের ডাকপিয়ন গগণ হরকরার এই ভক্তিভাবের গানটিও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। প্রেমের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তড়িৎ খেলিয়ে থাকে যে বাউল, সেই বাউলই অধরা মাধুরীকে ধরে রাখতে পারে আপনার বিশ্বসংসারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বাউল গান’ প্রবন্ধে লিখেছেন—‘‘যাহাদের বড় প্রাণ তাহারা বেশিদিন নিজেদের মধ্যে বন্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। চৈতন্যদেব ইহার প্রমাণ। যাহাদের ছোট প্রাণ তাহারা অনেকদিন নিজেকে লইয়া টিকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া চিরকাল পারিবে না। অনন্তকালের খোরাক আমার মধ্যে নাই।’’ খাঁটি বাংলা ভাষা আছে এই বাউল গানে, আর তাতেই সহজে যেন অন্তরের অন্তঃস্থল যেন স্পর্শ করে যায়। সংস্কৃত বা ইংরেজী শিক্ষাভিমান বর্জিত শ্রোতাও মাতৃদুগ্ধের মতো সহজেই যেন এই আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে। বাউলের প্রকাশ যেন দেশীয় ভঙ্গিতে, দেশীয় রীতিতে, দেশীয় ভাবে হয়ে থাকে। আর সর্বদা মানবমনের একটি চিরন্তন গভীরতাকে প্রকাশ করে চলে এই গান, যা আপনার গানে, আপনার ভাবে, আপনার মনন-চিন্তনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই গান, যা মনের মণিকোঠায় এক অনির্বচনীয় ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে—

‘‘ওরে মন পাখি, চাতুরী করবি কত আর
একদিন ফাঁদে পড়তে হবে, সব চালাকি ঘুচে যাবে
দেখবি চোখে অন্ধকার।’’

—এই বড় প্রাণ পূজারীই হল বাউল। এই বাউল আপনা থেকেই আপন সুরে গলায় ফুটে ওঠা গান, যা খাঁটি লোকজীবনের জন্য গাঁথা গান, যেখানে বিদেশী সুরের মিশ্রণ যেমন নেই, তেমনি নেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বৈদগ্ধ্যও। তার সুর লৌকিক, তার আশ্রয় আত্মশক্তির জাগরণ, তার উদ্দেশ্য যেন লোকজাগরণ। চৈতন্যদেবও তাই মহাবাউল—

‘‘কেন আমার বুলি
ছাড়ো মন তোমায় বলি
কেন রে আছো ভুলি শ্রীরাধারমণে।’’

এই ক্ষুদ্র আমি থেকে বৃহৎ আমিতে পৌঁছানোর গানই হল বাউল। আর এই গানে চায় শুধু আপনাকে নিবেদনের ইচ্ছে। ‘আমি’ বা ‘অহং’কে বিসর্জন দিয়েই বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। আর অযথা ‘আমি’ ‘আমি’ করে নিজেকে শুধুমাত্র গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখা যায়, যা বাউলের একান্ত কাম্য নয়। তাই তিনি বলেছেন—

‘‘আমি আমি করি কিন্তু,
আমি আমার ঠিক হইল না।’’

আসলে সমস্যার কথা বলতে গেলে বলতে হয় বাঙালি ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি, ঠিক মানুষটি সঠিকভাবে

ধরতে পারেনি। তাই সংস্কৃত, ইংরেজি বিষয়ের সর্বত্র তল্লাশি চালিয়ে যায়, কিন্তু বাকি থেকে যায় হৃদয়ের গোপন গভীর অনুসন্ধানের। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলতে হয়—''সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, আর ইংরেজি ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই। বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে।... আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা, আমরা যদি আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙ্গালী যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।... ভাবের ভাষার অনুবাদ চলে না।" বাউল গানে এসবই খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

ক্ষিতিমোহন সেন অজস্র বাউল গান রবীন্দ্রনাথকে শোনালেন, নানান তথ্য জানালেন বাউল বিষয়েও। অধ্যাত্ম দর্শন ও মানবপ্রেমের অপূর্ব মিলন দেখালেন রবীন্দ্রনাথ বাউলের গানে। মানবমনের সহজাত ভাগবৎ প্রেমই হল তাঁর 'মানুষের ধর্ম', 'মানবসত্য'। রবীন্দ্রনাথ জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে নিজেকে 'ব্রাত্য', 'মন্ত্রহীন', 'পংক্তিহারা' বলেছেন 'পত্রপুট'-এর একটি বিখ্যাত কবিতায়। যেখানে নিজের অধ্যাত্মদর্শনের সঙ্গে বাউলের অধ্যাত্মদর্শন যখন অনেকাংশে মিলে গেল তখনই প্রভাবিত হলেন রবীন্দ্রনাথ—

''কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে
সে নদীর সেই কোন দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।
আমি কবি ওদের দলে
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।"

১৯২৫ সালের ভারতীয় দর্শন সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে বাউল গানের দর্শন ব্যাখ্যা করেন এবং পরবর্তীতে তা থেকেই শিক্ষিত সমাজের নজর পড়ে যায় বাউলর গানের উপরে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাউল গানের সুরে নিজের লেখা বহু গান রচনা করেছেন। তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন—

''খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম তারি পায়।"

এর উল্লেখ একমাত্র অনির্বচনীয়তাকে আভাসিত করার জন্যই। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ যে সীমা-অসীম তত্ত্বের দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন সেখানে লোক-সঙ্গীতের অনাড়ম্বর ভাষায় তারই প্রকাশ দেখে মুগ্ধও হয়েছেন। স্বদেশী সংগীত ও কবিতার একটি সংকলন ১৯০৫ সালে তিনি নিজে প্রকাশও করেছিলেন এবং যার নাম দিয়েছিলেন 'বাউল'। এই গ্রন্থটি সাধারণ মানুষের অন্তরে প্রবেশাধিকারের জন্যই লিখিত হয়।

'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রাণের কথাই উল্লেখ করেছেন। অন্যের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করবার ক্ষমতাকেই তিনি কবিত্ব বলেছেন। চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি। এক পংক্তি লিখে তিনি দশ পংক্তি পাঠককে দিয়ে লিখিয়ে নেন। এখানেই তার কবিত্ব, এখানেই সহজ ভাবের ব্যঞ্জনা। একটু অন্যরকমভাবে বললে বলতে হয় চণ্ডীদাস এবং জয়দেব বাউল ভাবের কবি। অন্যের প্রাণ, প্রকৃতির প্রাণ, আপনার প্রাণ একবৃন্তে ফুটিয়ে তোলার কবি, সহজ কবি। শিলাইদহে থাকালালীন কর্মচারী রামচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে লালন ফকিরের গান লিখিয়ে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং তা পরবর্তীতে 'প্রবাসী' পত্রিকায় কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তবে বাউলদের গোপন সাধনক্রিয়া বা আচার অনুষ্ঠানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোন আগ্রহই ছিল না। ইতিহাসের দৃষ্টিতে বাউলধর্মকে, বাউল গানের ভাব ও ভাষাকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, বাউল তত্ত্বকে তিনি আপনার জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন এবং বাউল সাধনায় তিনি হিন্দু-মুসলমানের ভেদকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করে

সত্যের মধ্যে উভয়ের মিলন সাধনাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। যে মহামিলনের গান যে বাউল গাইতে পারে তাকে শ্রদ্ধা জানানো ছাড়া কোনো উপায় নেই। লোক-সাহিত্যের এমন অপূর্বতা অন্য কোথাও আছে বলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও বিশ্বাস করেননি।

দীনহীন ভূষণহীণ নিষ্ঠাবান যে শক্তি সেই শক্তি ও সন্ন্যাসীই রবীন্দ্রসাহিত্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীরূপে আবির্ভূত—

''রাজা তুমি নহ যে মহাতাপস
তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয়।।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন,
তোমারি মন্ত্র অগ্নিবচন,
তাই আমাদের দিয়ো।''

(গীতবিতান)

স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে

শুক্লা মণ্ডল

ডি.এল.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)

আমাদের দেশ যখন পরাধীনতার গ্লানিতে অন্ধকারাচ্ছন, দেশের সর্বত্রই হতাশা, অসহায়বোধ যখন আমাদের দেশ ও জাতিকে গ্রাস করে ফেলেছিল, ঠিক তখনই দূর্বল ও অসহায় ভারতবাসীর পাশে পবিত্রতার প্রতীকরূপে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তার আত্মবিশ্বাসের বাণীতে ভারতবাসী আবার জেগে উঠল। ভারতবাসীর শিরায় শিরায় প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল। তিনি তার নিজের জীবন দিয়ে ভারতবাসীকে দেখিয়েছেন ও বুঝিয়েছেন আত্মবিশ্বাসের জোরে মানুষ কী না করতে পারে—তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত তিনি নিজে।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সাহসী ও শক্তিদায়ক একজন ব্যক্তিত্ব। আর সেই কারণেই তার আরেক নাম বীরেশ্বর। তিনি ছিলেন সত্যের পূজারি। বিবেকানন্দের জন্ম হয়েছিল এক বিরাট প্রতিভার অধিকারী হয়ে। তিনি আমাদের দেশ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে জ্ঞান ভাণ্ডার সংগ্রহ করেছিলেন, তার সঠিক বিকাশ ঘটেছিল তাঁর নিজ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মিলন শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বামীজীকে নিজের মনের মতো করে তৈরি করেছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একজন ব্যক্তিকে চেয়েছিলেন, যাকে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি উজার করে দিতে পারেন ও তাঁর বাণী সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সবচেয়ে ভালোলাগার জায়গা ছিল ভারত। তাঁর কাছে ভারতবর্ষ ছিল পূণ্য ভূমি, ধর্মভূমি ও দেবভূমি। তাঁর কাছে ভারতমাতাই ছিলেন সকল সাধনার দেবী। বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য তাঁর চেষ্টার কোনো অন্ত ছিল না। স্বামীজীর মা ভূবনেশ্বরী দেবী তাঁকে শিখিয়েছিলেন যে, সবসময় যা সত্য বলে মনে করবে তাই করবে। মায়ের এই শিক্ষার প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জীবনের প্রতিটি কথায় কাজে ও আচরণে। তাঁর বাণী—

‘‘সত্যের জন্য সব কিছুকেই ত্যাগ করা চলে,
কিন্তু কোন কিছুরই জন্য সত্যকে বর্জন করা চলে না।’’

বিশ্ব শীতলিকরণ :
বাস্তব নাকি অনুমানমাত্র??

সুদীপ্ত দাস

সহকারী অধ্যাপক, বালুরঘাট বি.এড কলেজ (এম.এড. বিভাগ)

১৯৭০-এর দশকে বিশ্ব শীতলিকরণ একটি অনুমান-মাত্র ছিল, কিছু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যাঁরা ঘটনাটিকে সমর্থন করেন, তাঁরা ছিলেন Hays, Imbrie, Shackleton এবং Easterbrook। তাঁরা একটি নতুন অনুমান প্রস্তাব করেন, বিশ্ব এমন একটি শীতলিকরণ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যা আন্তঃউপচক্রের একটি ছোট অংশ। পৃথিবীর জলবায়ুচক্র হিমবাহ এবং আন্তঃহিমবাহ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায় যেটি Orbital Forcing-র সাথে যুক্ত। Orbital Forcing হল এমন একটি ঘটনা যেটি পৃথিবীর অক্ষ ও তার কক্ষপথের আকৃতির পরিবর্তনের সাথে যুক্ত, যার ফলে সূর্যালোকের স্থায়িত্বকাল, তীব্রতা, এবং ঋতু পরিবর্তন প্রভাবিত হয়।

1945 সাল থেকে বিশ্বের তাপমাত্রার ক্রমাগত হ্রাস ও একই সাথে গ্রীণ হাউস গ্যাসের দ্রুত বৃদ্ধি বৈজ্ঞানিকদের ভাবিয়ে তুলেছিল। 10%-র কম বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতে বিশ্বের শীতলতা নিয়ে চিন্তিত হলেও বাকি বিজ্ঞানীরা বিশ্ব উষ্ণায়নের পূর্বাভাষ দিয়েছেন। বর্তমান আন্তঃহিমবাহ সময়কাল তাপমাত্রায় শীতল ও উষ্ণ পর্যায়ের সাথে যুক্ত, যেটি সার্বিকভাবে তাপমাত্রার ধীর বৃদ্ধিকেই ইঙ্গিত করছে।

বিংশ শতকের মাঝামাঝি বিশ্ব শীতলিকরণের কারণ হিসাবে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়—

Pacific Decadal Oscillation (PDO)—এটি এমন একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় জলবায়ু পরিবর্তন যা মোটামুটি 20-30 বছর ধরে স্থায়ী থাকে। এই দীর্ঘসময় ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা হ্রাস ঘটে এবং পূর্বাঞ্চলের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, এর পরের বছরগুলিতে এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়।

North Atlantic Oscillation (NAO)—এটি এমন একটি জলবায়ু সংক্রান্ত ঘটনা যা আটলান্টিক মহাসাগরের Barmuda–Azores উচ্চচাপ ও Icelandic নিম্নচাপের সাথে যুক্ত। এই দুই চাপের বৈপরীত্য পশ্চিমাবায়ুর স্থায়িত্বকাল ও তীব্রতাকে Control বা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

Sun Spot Activity—এটি Global Cooling-র একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রক। প্রতি 11 বছর অন্তর সৌরঝড়ের তীব্রতা যখন চরমে পৌঁছায়, তখনই সৌরকলঙ্কের উপস্থিতি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। এই 11 বছর ধরে যখন Solar Cycle চলতে থাকে পৃথিবীর তাপমাত্রাও তখন পরিবর্তিত হতে থাকে। বর্তমানে সূর্য 'Ground minimum' পর্যায় চলে এসেছে, যা বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করে। যার ফলে শীতল গ্রীষ্মকাল, উষ্ণ শীতকাল, ও ফসল ফলানোর সময় পরিবর্তন, ইত্যাদি ঘটনা চোখে পড়তে পারে। আবহাওয়াবিদ John Dalton-এর মতে 1790 থেকে 1830 সালের মধ্যে Sun Spot-এর গড় তাপমাত্রা প্রায় 2°C হ্রাস পেয়েছে। এই সময়কালকে

'Dalton Minimum' বলা হয় যা ক্রমহ্রাসমান Solar activity-র সাথে যুক্ত।

তৎকালীনকালে বিভিন্ন বিশ্ব উষ্ণতা সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা গেছে গত 15 বছর সময় ধরে বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়নি। সেগুলি থেকে আমরা বলতে পারি, Global Warming অস্তিত্ব শেষ দশক গুলিতে ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। এর সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলা তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

সবশেষে আমরা বলতেই পারি যে, সাময়িক বছর ধরে যে Global Warming-র আমরা অভিজ্ঞতা পেয়েছি, সেটি প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ জলবায়ুচক্রের অংশমাত্র। শেষ হিমযুগের স্থায়িত্ব ছিল প্রায় 15000 বছর আগে, Milankovitch-র theory অনুযায়ী হিমযুগের পুনরাবৃত্তি ঘটে 20,000 বছর অন্তর অন্তর। হয়ত, 5,000 বছর পর কোনো একটি Mini Ice Age আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ততক্ষণ শুধু কিছু সময়ের অপেক্ষা.....

কোভিড-১৯ মহামারী

তনুশ্রী সাহা

বি.এড (প্রথম সেমিস্টার)

কোভিড—১৯ বলতে করোনা ভাইরাস রোগটিকে বোঝায়। এই রোগটির প্রাদুর্ভাব বিশ্বব্যাপী দ্রুত বিস্তার ঘটিয়েছে। এই রোগটি একটি বিশ্বের মধ্যে বিশেষ ভাইরাসের কারণে সংঘটিত হয়, যার নাম 'গুরুতর তীব্র শ্বাসযন্ত্রীয় রোগলক্ষণসমষ্টি সৃষ্টিকারী করোনা ভাইরাস। এই রোগটির প্রাদুর্ভাব প্রথমে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের হুপেই প্রদেশের উহান নগরী ও পরবর্তীতে উহানকে পরিবেষ্টনকারী হুপেই প্রদেশের অন্যান্য নগরীতে জরুরি অবরুদ্ধকরণ জারি করলেও রোগটির বিস্তার বন্ধ করতে ব্যর্থ হয় এবং এটি দ্রুত চীনের অন্যত্র এবং পরবর্তীতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রোগটিকে ২০২০ সালের ১১ মার্চ তারিখে একটি বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কোভিড—১৯ অতিমারিটির প্রথম ঘটনা ভারতে ৩০ জানুয়ারি ২০২০ সালে হয়েছিল যেটি চীন থেকে শুরু হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০২১ সালে অনুসারে মোট সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা ৩,৩৭,৬৬, ৭০৭ জন যার মধ্যে ৪,৪৮,৩৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩,৩০,৪৩,১৪৪ জন সুস্থ হয়ে গেছে। ভারতে অন্যদেশের তুলনায় কম হারে মানুষদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হচ্ছে তাই বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন যে, সংক্রমণের সংখ্যাটি যথেষ্ট পরিমাণে অবমূল্যায়ন হতে পারে। ভারতে কোভিড ১৯-এর মৃত্যুর হার ১ অক্টোবর ২০২১ অনুসারে ১.৩৩%। ভারতে কোভিড—১৯ পরীক্ষা ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ অনুসারে প্রতি দশ লক্ষে ৪,০৯,১৮০.৯৯ জন। এই রোগটির জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ভাইরাস সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়ার ঘটনা অন্যান্য দেশের সাথে সংযুক্ত থাকায় ভারত সরকার সমস্ত পর্যটন ভিসা স্থগিত রেখেছে। ২৩টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ৫৪৮টি জেলা সম্পূর্ণরূপে লকডাউন বা অবরুদ্ধকরণ অধীনে আছে।

২০২০ সালে ২২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে ভারত ১৪ ঘণ্টা স্বেচ্ছাসেবামূলক জনতা কার্ফু পালন করেছে। যেখানে কোভিড—১৯ সংক্রমণ ঘটেছে সেই ৭৫টি জেলার পাশাপাশি সমস্ত বড় শহরগুলিতেও সরকার অবরুদ্ধকরণ বা লকডাউন করে তা অনুসরণ করেছে। পরে ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী ১৩০ কোটি জনসংখ্যা সমৃদ্ধ, সারা ভারতে ২১ দিনের জন্য লকডাউনে নির্দেশ দিয়েছেন। ২৪ মার্চ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার ২১ দিনের জন্য দেশব্যাপী লকডাউনের নির্দেশ দিয়েছিল, ভারতের ২০২০-এর করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারীর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ভারতে সমগ্র ১৩০ কোটি জনসংখ্যার চলাচলকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। এটি ১৪ ঘণ্টা স্বেচ্ছাসেবী জনতা কার্ফু, তারপরে দেশের কোভিড—১৯ আক্রান্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ প্রয়োগের পর লাগু করা হয়েছে। যখন ভারতে নিশ্চিত করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা প্রায় ৫০০ ছিল, লকডাউনটি তখন শুরু করা হয়েছিল। আমাদের এই দেশের প্রধান লক্ষ্যসমূহ ছিল ভারতে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব বিস্তার রোধ করা। তারপর লোকদের নিজের ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ। এরপরে ওষুধের দোকান, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, মুদির দোকান এবং অন্যান্য

প্রয়োজনীয় পরিষেবা ব্যতীত সমস্ত পরিষেবা এবং দোকান বন্ধ হয়েছে। এই রোগের জন্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বন্ধকরণ করা হয়েছে। এই রোগের জন্য সকল শিক্ষামূলক, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রতিষ্ঠানের স্থগিতাদেশ করা হয়েছে। এরপরে সমস্ত উপাসনালয় বন্ধ করা হয়েছে। এরপরে সমস্ত অপরিহার্য নয় এমন সরকারী এবং ব্যক্তিগত পরিবহন বন্ধ করা হয়েছে। এরপরে এই রোগের জন্য সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধূলা, বিনোদন, একাডেমিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ নির্দিষ্ট এই অবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে। অন্যান্য মন্তব্যকারীরা লকডাউনের দ্বারা অর্থনৈতিক বিধ্বস্ততার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। এই অর্থনৈতিক বিধ্বস্ততার ফলে অস্থায়ী শ্রমিক, ক্ষুদ্র প্রকল্প, কৃষক এবং স্ব-কর্মসংস্থানকারীদের উপর বিরাট প্রভাব পড়েছে। যারা, পরিবহনের এবং বাচ্চাদের যেখানে অভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছে না। লকডাউনটি লোকদের ঘর থেকে বেরোতে বাধা দেয়। প্রয়োজনীয় পণ্য, অগ্নি নির্বাপক, পুলিশ এবং জরুরি পরিসেবা পরিবহনের ব্যতিক্রম সহ সমস্ত পরিবহন পরিষেবা—রাস্তা, বিমান এবং রেল স্থগিত করা হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প সংস্থা এবং আতিথেয়তা পরিসেবাগুলি স্থগিত করা হয়েছিল। খাবারের দোকান, ব্যাঙ্ক এবং এ.টি.এম, পেট্রোল পাম্প, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের পরিসেবাগুলি এবং তাদের উৎপাদন অব্যহতিপ্রাপ্ত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে যে, যে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি মানতে ব্যর্থ হবে সে এক বছর পর্যন্ত জেল খাটতে পারে। এবার ভারতে কোভিড—১৯ মহামারী টিকাকরণ উদ্বোধন করা হয়েছিল ১৬ জানুয়ারি ২০২১-এ। ২৭ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ১০০ কোটির বেশি ভারতীয় কোভিড টিকার দুইটি ডোজ গ্রহণ করেছে। টিকাকরণে সফল হলে ভারত এই বৈশ্বিক মহামারী থেকে সফলতা পাবে বলে আশা করা যায়।

মোবাইল ফোন : ড্রাগস

দুর্জয় চৌধুরী

এম.এড (প্রথম সেমিস্টার)

মোবাইল নামক যন্ত্রে ছোট থেকে বড় সকলেই আসক্ত। মোবাইল ফোন যুব সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোন ছাড়া যেন জীবন চলে না। এখন জন্মের পরই মোবাইল ফোন চাই। কম বেশি প্রত্যেকটি মানুষ মোবাইলের নেশায় মেতে উঠেছে—ঠিক যেন ড্রাগসের নেশা। ড্রাগসের নেশা যেমন যুব সমাজকে ধ্বংস করছে, তেমনি মোবাইল ফোনের নেশাও যুব সমাজকে অবনতির পথে এগিয়ে দিচ্ছে। যুব সমাজ হল আগামীর আলো, ভবিষ্যতের কাণ্ডারী। কিন্তু এই যুব সমাজ ড্রাগস স্বরূপ মোবাইল ফোনের মারণ নেশায় নেশাগ্রস্ত। যার ফলে আগামী সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চলেছে। আজ একটা পাঁচ বছরের বাচ্চাকে খাওয়াতে গেলেও মোবাইল ফোনের প্রয়োজন হয়। সেই পাঁচ বছরের বাচ্চাটাও মোবাইল ফোনে আসক্ত। এতে তাদের পাচন ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়। এই যুব সমাজ মোবাইল ফোনে ডিজিটাল গেমের মতো মারণ রোগে আক্রান্ত। এর ফলস্বরূপ তাদের নৈতিক জ্ঞান, বৌদ্ধিক বিকাশ, শারীরিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা, মস্তিষ্ক হয়ে উঠছে উগ্র। শুধু তাই নয়, তাদের মনকে করে তুলছে সংকীর্ণ, একাকীত্ব। প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে, হয়ে উঠছে সামাজিক থেকে অসামাজিক জীব। ড্রাগসের নেশাও মানুষকে অসামাজিক করে তুলছে, অপরাধমূলক কাজে চালিত করছে। আগেকার দিনে কম বেশি সবাই প্রকৃতির কোলে বিচরণ করত, খেলাধূলা করত, শরীর চর্চা করত। কিন্তু বর্তমান যুব সমাজ তার বিপরীত অবস্থা। আগে বই পড়ার ঝোঁক ছিল প্রবল। কিন্তু মোবাইল ফোন আবিষ্কার হবার পর ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় প্রায় সকলেই এতটা আসক্ত হয়ে পড়ে যে বই পাঠের অভ্যেস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চারা কান্না করলে বা জেদ করলে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে মোবাইল ফোন। তাদের বোঝানো বা মন ভোলানোর কোনো চেষ্টা করা হয় না। আগেকার দিনে বাচ্চাদের গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়ানো হত। কিন্তু মোবাইল ফোন হওয়ায় সেই জায়গাটা নষ্ট হতে চলেছে। যুব সমাজ মোবাইল ফোনে এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েছে যে তারা জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছে। যারা ড্রাগসের নেশায় আসক্ত তারা পশুত্বে পরিণত হচ্ছে। এর ফলে আগামীতে তীব্র সংকটের মুখে পড়তে চলেছে যুবসমাজ তথা সমগ্র সমাজব্যবস্থা।

বাঘাযতীন

সায়নী ঘোষ

ডি.এল.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কুষ্ঠিয়ার কয়া গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮০ খ্রি: ৮ ডিসেম্বর। মাত্র ৫ বছর বয়সে তাঁর পিতা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

প্রথমাবধি যতীন শরীর গঠনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। সেজন্য তিনি নিয়মিত দেহচর্চা, খেলাধুলা, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা, বন্দুক ছোঁড়া ইত্যাদি অনুশীলন করতেন। আসলে বিদেশি শাসকদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নিজেকে সমস্ত দিক দিয়েই প্রস্তুত করে তুলছিলেন যতীন।

১৮৯৮-তে তিনি এন্ট্রাস পাশ করেন। তারপর কলকাতায় সেন্ট্রাল কলেজে এফ.এ.-তে ভর্তি হন। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্ষেত্র গুহ-র আখড়ায় নাম লিখিয়ে নিয়মিত চলতে থাকে দেহ-গঠনের অনুশীলন। পড়তে পড়তে শর্টহ্যান্ড শেখাও চলতে থাকে। সেই সূত্রে তিনি একটি চাকরীও পেয়ে যান বিহারের মজঃফরপুরে। পরে সেখান থেকে তিনি বেঙ্গল সেক্রেটোরিয়েটে চাকরি নিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। ১৯০১-'০২ থেকেই অত্যাচারী দুর্বিনীত ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে দেশের তরুণ সম্প্রদায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু করে। তাতে যোগ দেন যতীন্দ্রনাথ। লর্ড কার্জনের বাংলাকে ভাগ করার ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে তখন শুরু হয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫)। পরাধীন ভারতবাসীর উপর তখন বিদেশি শাসকদের অত্যাচার চরমে পৌঁছেছিল। একবার দার্জিলিং-এ যাবার সময় ট্রেনের মধ্যে তার প্রতি অকারণ দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে চারজন গোরা সৈন্যকে তিনি একাই উত্তমমধ্যম দেন। দোকানদারদের প্রতি সেনাবাহিনীর জুলুমবাজির বিরুদ্ধেও ইংরেজ সেনার নাকে ঘুষি মেরে তাকে ধরাশায়ী করেছিলেন অসীম সাহসী যতীন। শরীরে ছিল তার অসম্ভব শক্তি। তাই বাঘে আক্রান্ত যতীন ভোজালির সাহায্যে বাঘকে হত্যা করেছিলেন। সেই থেকেই যতীন মুখার্জী 'বাঘাযতীন' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

তাঁর নির্দেশেই ভয়ংকর অত্যাচারী সি.আই.ডি সামসুল আলমকে হত্যা (১৯১০-এর ২০ জানুয়ারি) করেন বিপ্লবী বীরেন দত্তগুপ্ত। কিন্তু তাঁরা সকলেই ধরা পড়েন। এই 'হাওড়া ষড়যন্ত্র' মামলায় কারারুদ্ধ হন তিনি। অমানুষিক নির্যাতন চলে তাঁর উপর।

কারামুক্তির পর ১৯১৫-তে যতীনের নেতৃত্বে ইংরেজ কর্তাদের বিরুদ্ধে দেশজোড়া সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়। সে সময়ের এক নির্মম, নিষ্ঠুর অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার ছিলেন চার্লস টেগার্ট। তার দলবলের সঙ্গে বালেশ্বরের বুড়ি বালামের তীরে সম্মুখ সংগ্রামে নামেন যতীন। প্রথম দিনের যুদ্ধে টেগার্ট পিছু হটলেও, দ্বিতীয় দিনে (১৯১৫-র ১০ সেপ্টেম্বর) টেগার্টের গুলিতে প্রাণ হারাণ দেশের এক নির্ভীক সৈনিক বাঘাযতীন।

MUSIC THERAPY AS A REMEDY FOR AUTISM

Dr. Aparajita Roy Chowdhury
Asst. Professor

Abstract

The present study attempts to focus on music therapy for Autism Spectrum Disorder (ASD). This study expounds two basic points related to autism and remedies for autistic problems which include the concept of autism and its concomitant symptoms and music therapy benefiting autistic children. The author explores, examines and elaborates ASD and sheds light on the psychophysical areas in children. She has recorded information regarding the disorders among children from reliable sources in this study and identified some processes to be followed in order to enable autistic children to cope with their problems to a considerable extent. In this respect, she has emphasized music therapy as a major process.

Introduction

Autism is a severe form of mental retardation or disease in children. It leads children to become not normal in social behaviors, responses, reactions, understanding and other related mental exercises. Medical guidance is a modern remedy for autism in the world. There are a number of therapeutic processes to fight autism and music therapy is one of those highly and highly cost effective.

Music Therapy is an established health profession that is increasingly recognized for its ability to aid in the treatment of individuals with neurological and neurodevelopmental disorders such as Autism Spectrum Disorders. Music therapy may help people with autism to improve skills in areas such as communication, social skills, sensory issues, behavior, cognition, perceptual/motor skills, and self-reliance or self-determination. It's a no-brainer that music is non-threatening, motivating and fun. People engage in music every day, but many overlook just how powerful of a tool music really is.

Autism spectrum disorder

Autism spectrum disorder (ASD) is a broad term used to describe a range of complex neurodevelopmental disorders that limits a person to social impairments, to relate to other people and communicate and is characterized by repetitive, restricted and stereotyped patterns of behavior.

The three main areas affected by the disorder are speech or communication, social skills, and behavior. Individuals with autism do not necessarily look obviously different from others, but may be impaired in their

speech, behavior, learning, and the way they perceive the world around them.

In India roughly 23 of every 10,000 children have autism, according to the first rigorous estimate of the country's autism prevalence. This rate, about 0.23 percent, is far less than the 1.47 percent in the United States (Jul 12, 2017). This disorder occurs in one in every 100 children in UK. According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) the prevalence of the autism spectrum disorder is about 1 in 59 children. Autism does occur more often in boys than in girls, with a 4:1 male-to-female ratio and occurs in all racial, ethnic, and socio-economic groups. Symptoms appear before age 3 years, though children may be diagnosed after the age of three years in many cases. Almost all parents notice symptoms within the first two years of their child's life.

Autism is not concerned about the disabilities of the person as many of them are found to have exceptional abilities and can navigate their own world. Autism can vary to great extent in terms of its severity as well as characteristics. It can occur in all socioeconomic and ethnic groups.

The usual symptoms of ASD are associated with different inabilities. The symptoms are:

1. *Lack of ability to point at things to show interest.*
2. *Deep desire to be alone and avoid eye contact with anyone.*
3. *Repetition of same actions time and again.*
4. *Gradual loss of skills that they once had learnt.*
5. *Failure to express own feelings or understand the feelings of others.*
6. *Failure to communicate, especially with words.*
7. *Dislike of 'pretend' games like feeding dolls.*
8. *Unusualness in reactions to smell, taste and sound.*
9. *Failure to respond to others even when they talk to him, but might respond to other sounds at the same time.*
10. *Difficulty in the adaptation to changes in routine.*
11. *Delay in learning to talk.*
12. *40% autistic children never talk at all.*
13. *Problems in starting a conversation and repetitive use of language.*
14. *Preoccupation with certain and limited topics.*

Repetitive behaviors and movements which include stereo type like hand flapping, compulsive behaviors like arranging objects in a line or stack, sameness and ritualistic behavior such as following the same rules and changing it is not welcomed, restricted behavior viz., limited interest on objects and being preoccupied with one, and self-injury like hand-biting, eye-poking etc.

Music Therapy for Autism

Music therapy for autism has a strong track record for helping children with autism who enjoy music and make progress in communication and social skills. Music therapy uses music to encourage positive human behavior and stimulate the senses in a controlled setting under the supervision of a licensed music therapist.

For a child with autism spectrum disorder (ASD), a music therapist might also write lyrics about specific behavior - for example, turn-taking. The therapist sings the lyrics to the melody of a song the child knows well. The idea is that the child might be better able to focus on sung information than spoken information. In therapy sessions, children listen to music, play musical instruments, sing and dance. Listening to music is often a part of educational activities to learn new words and how to put sentences together. Playing music stimulates senses. Dancing and singing can be a part of self-expression and teaching improved communication skills. Music therapy can address many different types of psychological, social, physical, cognitive, language and behavioral issues.

Why music therapy is good for autistic children :-

The autistic child learns to engage, relate and learn through songs, instruments and play in the way most suitable for their brain's sensory processing and functioning. The child receives attention to her whole being: physical, emotional, cognitive and spiritual. The child leads the way by revealing where they are ready to learn. Through singing comes support learns language and self-expression. Because the whole brain, including the executive function, is activated, global learning and development occur. The child engages in creative play. The child relaxes and develops a healthier sense of self. The child feels cared for and supported.

Music therapy is done directly with the child. Parents must participate in this, especially in the early stages, as it can help support the parent-child relationship. Imagine that a four year old climbs into his mom's lap and snuggles for the first time while listening to a song about him relating to a toy!

Benefits of Music Therapy for Autism:

Effective and systematic music therapeutic treatment :-

***Increases language comprehension skills:** A therapist may play songs that relate to specific activities to help the patient understand the meanings of words.*

***Encourages speech:** The therapy can involve adding syllable and consonant-vowel sounds to music to increase language skills. The sounds help the person understand the pronunciation of words.*

***Helps with sensory issues:** The music helps stimulate senses, focus attention*

and redirect self-stimulating behaviors toward socially appropriate behavior.

Improves two-way communication: *Music can help build social skills and encourage peer interaction and conversation.*

Promotes self-expression and emotional response: *Music allows a person with autism to play music, dance, move, make noise or sing to express emotions.*

Reduces monotone speech: *Singing can help reduce monotonic speech by providing examples of the rhyming, word pronunciation and flow of speech accompanied by music.*

Music therapy is particularly effective in developing speech and language skills. Speech and language impair-ments in autism range from mute to limited speech ability. Speech patterns may include sound making such as grunts or sophisticated nonsensical phrases.

Some people with autism also experience echolalia, the automatic repetition of words or phrases out of context. Both hemispheres of the brain process music, which allows a therapist to use music to stimulate cognitive function and build speech skills.

Music therapy can also teach appropriate responses to questions. The therapist may ask the patient to listen to a musical phrase or sound and explain what they hear. This helps a person put certain sounds in the appropriate context and may help with fear-induced self-stimulatory behavior and sensory issues.

Conclusion

Music therapy may be prescribed as one of the scientific therapeutic processes for the remedy for children's abnormalities due to autisms. It has proved to be an effective prescription for autistic children to overcome their respective autistic problems. The author has shown that children affected by autism can gain communicative skills through language or linguistic sounds and may finally be rehabilitated socially.

Bibliography

The Reason I Jump: The Inner Voice of a Thirteen-Year-Old Boy with Autism, Naoki Higashida.

Thinking in Pictures: My Life with Autism, Temple Grand in, Ph.D.

Autism-A Handbook of Diagnosis & Treatment Of ASD, Sumita Bose.

Early Childhood Music Therapy and Autism Spectrum Disorders, edited by Petra Kern and Marcia Humpal.

Music Therapy for the Autistic Child, Juliette Alvin and Auriel Warwick.

Music Therapy and Autism Across the Lifespan: A Spectrum of Approaches, edited by Henry Dunn and 4 more.

THE UNPREDICTABLE HUMAN NATURE

Abhisha Basak

B.Ed., (2nd Semester)

The study of human nature is connected with the search for historical, philosophical & socio historical premises that tell us convincingly about the need to consider that the nature of power already existed in the writing of Plato & Aristotle.

Unpredictability of this power or the natural growth of this power is from the trait of doing things in a way that is irregular. So the mechanisms that make us unpredictable are still a fundamental part of our cognitive system.

We homo sapiens are complex creatures with different ideologies, thought processes and perspectives. Each person is unique with different opinions and choices. Not every person reacts or responds in a same way when they are put in a similar situation. The unpredictability lies in the way a person feels or expresses an emotion or feeling.

Let's take some examples–

(1) A person has a habit of banging his fist on the table hard when he is angry, but you can be sure that he will certainly not do that when the table is made up of glass.

(2) A person has the habit of throwing whatever is there in his hand when he is angry but he will certainly not do that when the thing in his hand is very costly. Let's say a brand new mobile phone that costs nearly Rs-150000/- will he?

(3) When a waiter is pouring you water and it spills on your shirt, you will shout at him but if the same mistake is done by your boss, you might only smile and say "it's okay''.

So, what we can interpret is that someone shows anger only on people whom they think are not stronger than him and who do not have the power to harm him back!

It would be really boring if it was predictable. There would be no element of surprise, there would be no point of doing things since you already know it. There are certain hormones and chemicals inside our brain which controls our behaviour, emotions, moods and all the ups and downs.

Let's go deeper into the history from this day to day life experiences. Historians, cultural anthropologists and social psychologists have accumulated plenty of evidence of this unpredictability.

Human nature in Aristotle can be understood as referring to the

human life forms, which is not only the form but also the end of human flourishing. History has seen many kings and rulers but what made the difference is their nature or the behaviour towards the civilization. We've seen King Asoka as well as King Aurangzeb both, arguably having the 2 extremes of nature.

So, from scientific point of view, the traits that carry this human nature is random and shows up in different forms but also some social factors help in the outcome of that trait. For example, family history & planning, environment, cultural factors, physical or mental health, Sexual behaviours, Education, Work life, Drug history, Govt. aids, Financial responsibilities or insecurities, Marital status, Conjugal life etc. All these factors are responsible for dramatic changes in human nature.

Whenever a man does the totally inexplicable, the totally incomprehensible-in social words-whenever he displays total madness, it can't be just because of social influence. Society makes one go mad, but within limits. It's your inner self that drives your nature and that's the beauty of human Life as it is UNPREDICTABLE.

জীবনের জন্য জীবন

অনুরাধা ভৌমিক

বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

আমাদের জীবনের একটি বিশেষ অংশ হলো **শিক্ষা**। যতদিন আমরা বেঁচে থাকি ততদিন আমরা বিভিন্ন রকম শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েই বেঁচে থাকি। শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা নয়—জীবনে চলার পথে আমরা যা যা দেখে থাকি, উপলব্ধি করে থাকি, অনুভব করে থাকি এবং তার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানও শিক্ষার একটি বিশেষ অংশ। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই শিক্ষার একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে—যে প্রভাব আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এককথায়, আমরা আমাদের জীবনকে **জীবন-দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা** বলতে পারি। এই শিক্ষা এমন এক শিক্ষা যা ব্যক্তিগত জীবন দক্ষতা যেমন আত্মপ্রতিবিম্ব, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সম্যসা সমাধান এবং আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করে।

বর্তমানে আমাদের জীবনে এক নতুন পরিবর্তন এসেছে—COVID-19। ছোট্ট করোনার বিরুদ্ধে মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের নীরব ঘোষণা দিয়ে মানবতাকে আতঙ্কিত করেছিল। লকডাউন এবং সরকারের পরামর্শের ফলে এটি সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছে। বিশেষত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে। বিভিন্ন পরিচালনা পর্ষদ, কাউন্সিল ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত পরামর্শ ও নোটিশগুলি গবেষণা ও সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনার উপর জোড় দিয়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা শিক্ষার সকল স্তরে পরিবর্তন এনেছিল।

COVID-19-এর ফলস্বরূপ শিক্ষাব্যবস্থার যখন পুরোপুরি টালমাটাল অবস্থা তখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা অন্যান্য বিকল্পগুলি অনুসন্ধান করতে থাকেন এবং জেডওএম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। উচ্চশিক্ষায় যেখানে কিছু শিক্ষক অনলাইন ক্লাস পরিচালনার জন্য জুমকে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছেন, এটি কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংগঠনিক প্রধানরা সপ্তাহব্যাপী এবং একমাস ধরে তাদের অধীনস্থদের সাথে কোনো আউটপুট ছাড়াই চলমান দিনব্যাপী বৈঠকের জন্য অপব্যবহার করেছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, যখন দেশ এবং সহকর্মীরা ভুগছিলেন—তখন এই প্রধানরা প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সুবিধাগুলির জন্য COVID-19 পরবর্তী সুযোগগুলি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যান।

জুম, কেলবমাত্র উচ্চশিক্ষায় সীমাবদ্ধ নয়, কেবল বিদ্যালয়গুলিতে পৌঁছেছিল এবং কিছু স্কুল এবং টিউশন ক্লাস অনলাইন ক্লাস পরিচালনা শুরু করেছিল। এগুলি যেমন কম ছিল, কিছু স্কুল প্রাথমিক এবং প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন ক্লাস শুরু করেছিল এবং এটি মর্মান্তিক এবং মজার বিষয় ছিলো যে—**মা তার সন্তানকে সাথে কোলে বসিয়ে তার হাতে একটি মোবাইল রেখে তার শিশুকে সহায়তা করছে তথাকথিত উপযুক্ত এবং উৎসর্গীকৃত স্কুলগুলি দ্বারা শিক্ষিত হওয়ার জন্য।** এটি **প্রযুক্তির অপব্যবহারের উচ্চতা** ছিল। ছোটো বাচ্চার পর্দায় থাকা কি এতোটা প্রয়োজনীয় ছিল এবং এটিও সে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না? প্রকৃতপক্ষে, পড়াশোনা করা প্রয়োজন তবে **বাড়িটি প্রথম স্কুল** এবং **মা প্রথম শিক্ষক।** আনুষ্ঠানিক পাঠ ছাড়াও, শিষ্টাচার, ভাগ করে

নেওয়ার এবং যত্নবান হবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলি মোবাইল ব্যবহারের অনুশীলন দেওয়ার পরিবর্তে পিতামাতার দ্বারা শেখানো যেতে পারে যা ইতিমধ্যে একটি বিপর্যয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই বাচ্চারা ভালো এবং খারাপ ভাগ করার পার্থক্য করতে পারে না। ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারিদের বয়স এবং পরিপক্কতার পার্থক্যও করতে ব্যর্থ।

শিক্ষা বোর্ড কাগজগুলির মূল্যায়ন শুরু করে এবং শিক্ষকরা কাগজপত্র মূল্যায়নের জন্য আসতে বাধ্য হয়। অবশ্যই এটি প্রয়োজনীয়, যখন করোনার উত্থান ঘটে তখন সুবিধাগুলি কম থাকে, কারণ সামাজিক দূরত্ব একটি সমস্যা এবং মানসিকতা অনুকূল নয়। তবুও প্রতিটি ব্যক্তি আক্রান্ত হবার ভয়ে এই সময়ে, এটি নিশ্চিত করে বলা কঠিন যে—সন্ত্রাসী মন যা আমাদের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয়তাকে সন্তুষ্ট করার আহ্বানকে মেনে নিতে দেয় না, দেহ এবং মন কাগজগুলি সাধারণভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত হতে হয়, অনেকের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাগজগুলি এরপর নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন ফল ঘোষণা করা হয়। সময়মতো ফলাফল ঘোষণার অর্থ শিক্ষার্থীদের বিকাশ ও প্রগতির দিকে অগ্রসর হয়।

শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্য অনলাইন প্রযুক্তির অস্থায়ী-ভাবে ভালো হতে পারে তবে এটি কোনও প্রযুক্তি শ্রেণিকক্ষের পাঠদানকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। কারণ **শ্রেণিকক্ষ অনুভূতি এবং আহ্বানিত ও উদ্বৃত্তদের প্রশান্তি দেয়,** যা ছাত্রদের অনাকাঙ্ক্ষিত সন্দেহ সম্পর্কে আলোচনা করে শুধুমাত্র উপস্থিতিতে প্রশান্ত করা। ওয়েবিনাররা হয়তো স্বাগত জানায় তবে এটি ঘনিষ্ঠতা বিকাশের সুযোগটি হাতছাড়া হয়। COVID-19 আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠনের পাশাপাশি মানবতার অভাব ইঙ্গিত দেয়। **শিক্ষক হল সেই জীবন যা শিক্ষার্থীর জীবনে যত্ন ও লালন-পালন করে সুগন্ধ যুক্ত করে।** শিক্ষকরা নিজের বিরুদ্ধে, ছাত্র-সমাজ যা দেশের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য সচেষ্ট হন। **শিক্ষকরা সমাজের মেরুদণ্ড এবং যদি মেরুদণ্ড দুর্বল হয় তবে সমাজের অগ্রগতি অবশ্যই অসম্ভব।** সমাজকে মানবিকতার জন্য এবং প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে জাতীয় চরিত্র বিকাশের জন্য শিক্ষাকে আরো জোরদার করা দরকার কারণ জীবনকেই জীবনের সাথে যুক্ত করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত **জীবনই জীবনের জন্য।** ইংরেজিতে একটি উক্তি রয়েছে—

> ‘‘Tell me and I Forget
> Teach me and I remember
> Involve me and I Learn.’’
>
> ***–Benjamin Franklin***

আমের টানে আমতলাতে

হরিপদ সাহা

শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ক উপদেষ্টা, (বালুরঘাট বি.এড. কলেজ)

ছুটির ঘণ্টা বাজার পরেও
কেউ যায় না কলেজ ছেড়ে।
নেইকো তাড়া বাড়ি যাবার—
ছুটছে সবাই আমতলাতে।

কারণটা পরে জানতে পারি—
একটু বাতাস উঠলে পরে—
ধুপ্-ধাপ্ আম পড়বে খসে
কলেজের আম-তলাতে।
রীতিমত ‘‘কম্পিটিশন’’—
কে আগে ধরবে এসে
হিমসাগরের টুঁটি চেপে।

ধুপ্ শব্দ শুনলে সবাই,
ড্রাইভ মারে আমের পড়ে
বয়েসটাকে উপেক্ষা করে।
সবাই খুশী বেলা শেষে
মিষ্টি আমের আঁটি চুসে।

বিজয়িনী

চাঁদ কুমার দাস

সহকারী অধ্যাপক, (বালুরঘাট বি.এড. কলেজ)

তোমার গভীর চিন্তন খাটুনিতে হতে হবে বিজয়িনী।
লক্ষ্য যদি থাকে জেতার, থেমে গেলে চলবেনা;
বাধা-বিপত্তি যতই আসুক।
তোমায়, এগিয়ে যেতে হবে তোমারই লক্ষ্যের পথ ধরে।
হোক না তোমার গমনপথ ঝঞ্ঝাট কন্টকময়,
তবু অটল থাকুক তোমার দৃঢ়—সংকল্পে ;
তথাপি তোমায় চলতে হবে তোমারই সংকল্পের পথে।
শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ-হেমন্তে, অতি মধুর বসন্ত সমীরণে;
তোমার মনোবল প্রত্যয়কে সম্বল করে।
যদি শরীরে মননে ক্লান্তি বুঝতে পারো,
তবু ধীর গতিতে চলবে কাছিমের ন্যায়।
কঠোর পরিশ্রমে বিশেষ জায়গায় পৌঁছতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হও,
পৃথিবীর যেমন সব সময় গতি আছে,
পৃথিবীর ন্যায় তুমিও আবার যাত্রা শুরু কর।
চলতেই থাকবে জানা থেকে অজানার পথে।
দেখবে একদিন, তোমার সর্জন পৌঁছে দেবে;
তোমারই স্বপ্নের ঊর্ধ্বে।
যেমন মেদিনীর পৃষ্ঠদেশে তৃণলতা গুল্মদলে,
তেমনি তুমিও হবে বজ্রজয়ী বনস্পতি।

জীবন

উজ্জ্বল চন্দ্র রায়

সহকারী অধ্যাপক, (বালুরঘাট বি.এড. কলেজ)

কখনো মনে হয়—
জীবনটা এক জনবহুল হাইরোড!
সমস্ত সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্নাকে দু'পাশে ফেলে রেখে,
অ-সত্যের সমাজ থেকে
সত্যকে হাতছানি দিয়ে,
ভাগ্যের বাম্পারে ধাক্কা খেতে খেতে
অ-লিখিত যন্ত্রণা বুকে আটকে রেখে—
এগিয়ে চলেছে.....।
আর;
শরীর নামক ব্রেকফেল হওয়া গাড়িটা
শুধুমাত্র হেডলাইট জ্বেলে
আদর্শের স্টিয়ারিঙে হাত রেখে
লক্ষ্য আর কর্তব্যের নিশানাতে পৌঁছানোর জন্য
সমস্ত ঝড় ঝাপ্টা সহ্য করে
ছুটে চলেছে.....
জানি না;
এর শেষ কোথায়?
গভীর অন্ধকারে নিহিত আছে
অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর শেষ আশা,
এখন
শুধু দেখার,
কতদূর গিয়ে টানবে তার
জীবন কর্তব্যের সমাপ্তির শেষ দাঁড়ি.....।

ভালোবাসার জন্য

পদ্মিনী চৌধুরী (মণ্ডল)

সহকারী অধ্যাপক, (বালুরঘাট বি.এড. কলেজ)

ছোট্ট একটি জীবন আমার—
সেই জীবন জুড়ে অনন্ত আশা
এ গল্প বলতে চাই না আর—
কিন্তু না বলেও উপায় যে নাই।

ঘরের সামনে ছিল ওর জানালা, চেয়ে দেখত সে আমাকে
মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে কি যেন বলবার চেষ্টা করত।
আমিও মাঝে মাঝে দেখতাম তার দিকে—বলতে চেষ্টা করতাম কিছু
কিন্তু বলতে পারতাম না,
এইভাবে দৃষ্টি বিনিময়ের ফলে আমার প্রাণে ফুটে উঠল ফুল।
সেই ফুল ফুটতে ফুটতে দিশাহারা করল আমাকে।

একদিন ঘুম ভেঙে হঠাৎ চমকে উঠলাম আমি—
হায়! সেই লতাটি কোথায় যে লতায় ফুল ফুটেছিল?
খুঁজে পাই না তাকে।
শূন্য মনের যন্ত্রণা নিয়ে ভাবি—সে কোথায়?
সে কোথায়.....সে কোথায়?
দিন যায় রাত আসে—সে কোথায়?
সেই জানালা—সেই আকাশ.....
সে কোথায়?
বাতাসের কানে মুখ রেখে বললাম—আমি তোমাকে ভালোবাসি
দশ বছরের অনন্ত প্রতীক্ষার শেষে মনে হল—
সে কি আসে!
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে মিশে যায় নিশ্বাসের প্রতিধ্বনি—
অন্য কোনোখানে.....
আজও আমি চেয়ে আছি, ওই জানালায়
শুধু একবার আমার ভালোবাসাকে দেখব বলে।

শম্পা দেব
বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

দ্বন্দ্ব

মানুষ হলো শান্তি প্রিয় প্রাণী
তাইতো হেথায়-হোথায় এতো শান্তির বাণী।
তবুও যে দ্বন্দ্বে চলে,
মনে হয় অদমনীয় মহাভারত চলে ;
কুরুক্ষেত্রকে লুকিয়ে বক্ষ তলে
ঠিক একইভাবেই দ্বন্দ্ব চলে।
তবে এ দ্বন্দ্ব অন্যকারোর সাথে নয়
এ কেবল নিজের মনের সাথেই হয়।
যখন ভাবি এইতো শান্তি মনে
সহস্র প্রশ্ন-চিন্তা একসাথে বাসা বুনে।
এই বুঝি কাউকে আঘাত দিলাম না-জেনে।
হ্যাঁ! দ্বন্দ্ব চলে,
সম্পর্কগুলো যখন দিবাস্বপ্নের মতো হয়
ভয় হয়, এই বুঝি ভেঙে যায়।
তার চেয়ে বরং নিজেই জেগে উঠি
বাস্তবতা আর স্বপ্নের মাঝে ভারসাম্য খুঁজি।
ভারসাম্যের আদালতে হয় স্বপ্নের বলি
তার চেয়ে যদি বাস্তবতাকে স্বপ্ন বলি!
বাস্তবতা যে কঠোরতার কথা কয়
সবশেষে দ্বন্দ্বেই বেঁচে আছি মনে হয়।

লকডাউন

ভেবেছিলাম এইতো নিউনরমাল টাউন
কালবৈশাখীর মতো আঁছড়ে পড়ল লকডাউন।
শত শত গরীবের পেটে মেরে লাথি
লকডাউন আবার এলো ফুলিয়ে ছাতি।
দোষারোপের খেলায় যখন মত্ত জনগণ
মহামারী না ক্ষুধা, দ্বিধায় অতিষ্ঠ শত জীবন।
মহামারী হয়েছে আজ মৃত্যুপুরী।
মৃতের স্তূপে জমিয়ে নিজের পা
ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা।
চারিদিকের সারাদিন এতো সতর্কবার্তা
কিছু লোক আজও দেয় না সে সব পাত্তা।
এ যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ
মৃতপ্রায় আর বর্বরবাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণ
সন্মুখে সস্ত্র লঘু যোদ্ধা যেমন।
তাই দোষারোপ ও গোঁড়ামী ছেড়ে, সতর্ক হন
আবার যেন না হয় কোনওদিন লকডাউন।

নিজেকে চেনা

মৌমা মুন্সি

বি.এড (প্রথম সেমিস্টার)

আমিত্বে ডুবে থাকলে স্বাধীনতার
স্বাদ পাওয়া যায় না।
অন্ধকারকে জড়িয়ে ধরলে
আলোর দিশা খুঁজে পাওয়া যায় না।
ঠিক তেমনি,
সময়ের সাথে না চললে
সময়কে টেক্কা দেওয়া যায় না।
সূর্যের আলো সবার জীবনে
ডাক দিয়ে যায়,
কিন্তু সে পাগলই হবে যে,
আলোর দিশা পেয়েও
দুয়ার বন্ধ করে নেয় এবং
অন্ধকারের কোলে আবার শুয়ে পড়ে।
জড়িয়ে পড়ে আবার সেই সময়ের জালে
যে জাল সে কখনও কাটাতেই পারেনি
পারেনি নতুন সভ্যতাকে আপন করতে,
পারেনি নতুন লেখা বইয়ের গন্ধ পড়তে,
পারেনি সে পুরানো সভ্যতার কুরুচিকর
সংস্কারের সাথে লড়তে,
পারেনি তার অভিজ্ঞতা দিয়ে
নতুনের পথ খুঁজে নিতে।
পারলে হয়তো, এই কঠিন দুনিয়ার সাথে
সে লড়তে পারতো।
পারলে হয়তো, নতুন আলোর দিশাকে
রামধনু রঙে রাঙিয়ে দিত।
পারলে হয়তো নতুন সূর্যের আলোয়
ধুয়ে ফেলত নিজেকে,
হয়ে উঠতো সে এক নতুন আমি।
কিন্তু সে পারেনি.....

আমি শিক্ষক

সঞ্জু কর্মকার

বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

আমি শিক্ষক
আমি রক্ষক মর্যাদার।
আমি নতুনের কেতন উড়ানো
বাঁশির সুর,
আমি নব পল্লবের উর্বরতা
সুমধুর।

আমি সৃষ্টি করি।
রোধ করি বিনাশ,
আমি শিক্ষক, গান করি তারুণ্যের।
আমি চারাগাছ রোপণ করি।
যেন সৃষ্টির নিবাস।

আমি অভিনেতা
চিন্তিত আমি সভ্যতায় সুদৃঢ়
আমি মুছে দিই শত গ্লানি,
আমি কোমল করে হাসি
সমান করি পথ,
যেথা বন্ধুর।।

আমি নতুনের অসীম আকাশ
পুরাতনের নির্যাস
আমি বন্ধুবর সবার।
হাতে আমার আলোর মশাল,
সত্যের পথচারী আমি,
সকলের বিশ্বাস।।

শুধু উপদেশে নই আমি।
বাস্তবতায় নিবিড়।
স্নেহে আমি, আমি মমতায়।
শৃঙ্খলা বোধে আমি—
পীড়িতদের পাশে দাঁড়াই উঁচু করে শির।

আমি কঠোর বজ্রসম
কোমল সত্য চিত্তে।
শতদলে বেঁধেছি যে ঘর,
ছায়া সুনিবিড়।
লক্ষ অলোর মাঝে,
আমি শিক্ষক
এক আলোময় বীর।

ভারতরত্ন

সুদেষ্ণা কুণ্ডু লাহা
এম.এড (প্রথম সেমিস্টার)

মা বলেছিলেন,
"ঘর, সংসার, ছেলে মেয়ে মানুষ করাই মেয়েদের নিয়তি।"
বাবা বলেছিলেন, "জীবনের সব স্বপ্ন পূরণ হয় না...."
এক প্রকার জোর করেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তার।
যেমনটা মধ্যবিত্ত সমাজের রীতিনীতি।

বিয়ের পরপরই তিন সন্তানের জননী।
তবুও সংসার, পুরুষশাসিত সমাজ
তাকে শৃঙ্খলিত করে রাখতে পারেনি।
সে ফিরে গিয়েছিল তার প্রিয় বক্সিং এরিনায়।
কঠোর অনুশীলন ও উইল পাওয়ারের দ্বারা
নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল
ঘরোয়া প্রতিযোগিতায়....।
আয়নায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিল,
"আমি নিয়তির লিখন মানি না।
আমার ভাগ্য আমি নিজেই গড়ব...
বক্সিং আমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা
বক্সিং ছাড়া কিছু জানি না।"

আর তাই আজ যখন তার বয়স চৌত্রিশ বছর প্রায়
অলিম্পিক, এশিয়াড, কমনওয়েলথ, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে
একের পর এক মেডেল জিতেই চলছে সে মেয়ে
একান্ত নিরলস প্রচেষ্টায়।
সোনা, রূপো, ব্রোঞ্জ কি নেই তার ঝুলিতে
তবুও একটা জয়ের পর থেমে থাকতে না চায়।
পুনরায় স্বপ্ন দেখে চ্যাম্পিয়ান হবার। বলে,
"তাও দেখে যারা কিসমে কিতনা হ্যায় দম..."
ট্রুলি সে চ্যাম্পিয়ান অফ দ্য চ্যাম্পিয়ান্স....
সে আর কেউ নয়, ভারতরত্ন মেরী কম!

সত্যজিৎ স্মরণে

জয়শ্রী রায়
বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

সিনেমা জগতে ভগীরথ যিনি
মহারাজা বলে সকলে চিনি
বঙ্গ-বাঙালির হৃদয় জুড়ে সদা সর্বদা বিরাজমান তিনি।

চলচ্চিত্র মাঝে বিস্তার করেছো তব শাখা-প্রশাখা
তোমার হাত ধরেই স্বপ্ন উড়ান দেয় মেলে দিয়ে পাখা
তাঁর কল্পনার বিস্তারকে কোনোভাবেই করা যাবে
না, আটক করে রাখা।

জীবন যুদ্ধে অপরাজিত তুমি পথেই লিখেছ পথের পাঁচালী
তোমার অবদানেই অপু-দুর্গা দেখল রেলগাড়ি
চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রমাণিত তুমি শতরঞ্জ খিলাড়ি

আজ তব জীবনের জলসাঘরে একশো বছর পূর্তি
কখনো হবে না ম্লান এ জগতে তব প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্রের মূর্তি।

শোষণ

উত্তম রবিদাস

বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

আমি ভূখা মানুষের কথা বলছি...
যারা, ক্ষুধার জ্বালায় ডাস্টবিন থেকে, টোকায় ক্ষুধার অন্ন
জীবনের সাথে যুদ্ধ করে একটু বাঁচার জন্য।
কতদিন অনাহারে, যায় না পেটে ভাত,
ক্ষুধার জ্বালায় ঘুম আসে না, জেগে কাটায় রাত।
আমি কৃষকের কথা বলছি...
যারা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, ফলায় সোনার ফসল,
ন্যায্য মূল্য পায় না তারা, মজুতদার করে উসুল।
কষ্টের ফসল কম দামে, কিনে মজুতদার,
সেই ফসল মজুত করে, গড়ে টাকার পাহাড়।
আমি শ্রমিকের কথা বলছি...
যাদের শ্রমের বিনিময়ে, ঘুরছে মিলের চাকা,
এতো শ্রম দিয়েও কেন, তাদের জীবন ফাঁকা?
মালিক শ্রেণি গড়ছে বাড়ি, কিনছে দামী গাড়ি,
শ্রমিক শ্রেণি তেমনি আছে, চুলায় শূন্য হাঁড়ি।
আমি শোষিতের কথা বলছি...
যারা শোষক, শোষণ করে, রাতারাতি হয় ধনী,
শোষিত শুধু দেখে চেয়ে চেয়ে, শোষক দেশের মণি।
আকাশ ছোঁয়া গড়ছে বাড়ি, হচ্ছে বড়ো নেতা,
গরীব দুখীর সেবার বালাই, নেইকো যেন সেথা।
আমি অধিকারের কথা বলছি...
পাঁচটি মৌলিক অধিকার, সবার আছে পাওনা,
শাসক শ্রেণি ভোগ করে তা, গরীব দুখী পায় না।
অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, করছে দুর্নীতি,
রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিতরণকালে, করছে স্বজনপ্রীতি।

জাদুকর

স্বাগত ঘোষ
ডি.এল.এড. (দ্বিতীয় বর্ষ)

কোনো এক ভোরে মুখোশের জাদুকর
কোনো অবসরে চুপিচুপি বিষদাঁত, তারপর
বিপন্ন, বিষণ্ণ, তবু হার মেনে নিতে নয়
যুদ্ধ বা সন্ধিই পরিচয়।

হারাইনি, খুন হয়েছি জাদুকর
ভেঙেছি, তবু নতজানু হয়ে বসে নেই, জাদুকর
শূন্য করিডোরে পদচিহ্ন রেখে যাই,
আগামীর বার্তা জানাই...

হাত বাড়ালেই শুধু উল্লাসধ্বনি
যেন ক্লান্ত জনতার ভুলের মিছিলে
বিভ্রান্ত জাদুকর হারিয়ে যায়
রহস্য আমায় ভাবায়।

ভাবছো তুমি চুপচাপ শহরে
গ্রাফিতি আঁকা দেয়াল জুড়ে
রক্তের দাগ ছড়িয়ে দেবে নিয়তির শরীরে
বুকের পাঁজরে..

কোনো এক ভোরে মুখোশের জাদুকর
কোনো অবসরে চুপিচুপি বিষদাঁত, তারপর...

তুমি সন্ধ্যারও মেঘ

জয়ন্ত বর্মন

বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

নিথর, নিশ্চল, শান্ত গিরি
কম্পিত হয় আলোড়নে,
কঠিন, ঊষর, পাষান মন
জাগে শিহরণে।
অন্ধকারে শিখা হয়ে
জাগিয়েছ প্রাণ,
প্রদীপ্ত করেছ মনেরে
হরিয়ে মনস্থান।
ধন্য তুমি, অসীম তুমি
অলীক কল্পনারও দূরে,
জাগিয়ে রেখেছ তোমার পদচিহ্ন
শুভ-অশুভের ভিড়ে।

নবান্ন

পম্পা তরফদার

এম.এড (প্রথম সেমিস্টার)

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ করেছে গমন
অগ্রহায়ণের আগমণ,
মাঠে-মাঠে স্বর্ণ শোভায়
ভরিয়ে যে তুলেছে আমন।
সকাল-সন্ধ্যা পরিশ্রমে
ভরিয়ে ক্ষেত নূতন গানে—
কৃষক মাতে আনন্দেতে
ভরবে গোলা নূতন সাজে।
রাঙিয়ে আঙিনায় দেয় আলপনা—
নতুন অতিথির হয় আনাগোনা
নতুন চালের পরমান্নে,
মন ভরে যাবে আঘ্রাণে।
মাতবে সাজে আচার-অনুষ্ঠানে
বারো মাসের তেরো পার্বণে,
আসবে ঘরে নতুন অন্ন
হবে বাঙালির নবান্ন।

অপেক্ষা

সুস্মিতা কুণ্ডু
বি.এড (প্রথম সেমিস্টার)

ভোরের আলো স্বচ্ছ আকাশ
দিচ্ছে মৃদু বাতাস
উড়ছে পাখি, বলছে শোনো
জাগো তোমরা জাগো!
ভোরের শেষে সকাল বেলা
চলছে কত গাড়ি-ঘোড়া
স্কুল অফিসের তড়িঘড়ি
ছুটছে সবাই, চলছে ঘড়ি
সকাল শেষেই দুপুর হয়
সোনালী রোদ ছড়িয়ে যায়।
মেলে খাওয়া, জমে আড্ডা
সময় বলছে বাজছে ঘণ্টা
দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়
বাড়ি ফেরার সময় হয়।
ফেরার পথের রাস্তাঘাট
সন্ধে নামার দেয় হাঁক।
সন্ধ্যেবেলার সন্ধ্যারতি
ঘন আকাশের আবছা বাতি
নিভে যায় সূর্যের আলো
ভরিয়ে দেয় চাঁদের আলো
সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি হয়
রাতের আকাশ স্তব্ধ হয়।
নিঃঝুম রাস্তা, শান্ত পরিবেশ
রাতের শেষে নতুন দেশ।।

ঘুমের দেশে

গৌরব মহন্ত
বি.এড (প্রথম সেমিস্টার)

ঘুমের দেশে যাবে যখন,
হাত বাড়াবে না কেউ তখন,
শূন্য বুকে থেকে যাবে অপূর্ণ ইচ্ছার পাহাড়।
আসবে আবার নতুন ভাবে,
মানুষ হোক বা অন্য রূপে,
চিনব ঠিকই তোমায়, শুধু হাতটা ধোরো আমার।।

শীতের আরাম

অর্পিতা বসাক

বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

ভিজছে শহর, মজছে মানুষ, শীতের বৃষ্টি ধারায়
খাওয়া দাওয়া, লম্বাঘুম আর কিছু না চায়।
পথের ধারে চারটি শিশু বৃষ্টি ভেজা গায়
মা তাদের কোনোরকমে জড়িয়ে আগলায়।
জোটেনি খাবার দুমুঠো তাদের আজকে সারা দিন
পারে না যে বলতে তারা ‘বাবু দুটো খাবার দিন’।
কোনো মানুষের নেইকো নজর, করছে সবাই হেয়
কারণ তারা মানুষ তো নয়, অবলা সারমেয়।
সত্যি আমরা মানুষ বটে, সাবাস মানব জাতি
কর্মে স্বার্থ, ধর্মে স্বার্থ, স্বার্থ নিয়েই মাতি।
একমুঠো ভাত দিলে তোমার, যাবে নাকো কমে
তারাই যে দূত ঈশ্বরের এই ধরাধামে।।

স্বপ্ন

কাকুলি বাস্কে

বি.এড (প্রথম সেমিস্টার)

ছোট হোক বা বড়ো
স্বপ্ন-ইচ্ছা-আশা সবারই আছে
পূর্ণ করে কেউ এগিয়ে যায়
সে সব ভেঙে কেউ বসে থাকে।
কখনো পরিবার,
কখনও সমাজ, কখনও বা টাকাও
হয়ে ওঠে বাধা.....
স্বপ্ন দেখা যতোটা সহজ
পূরণ করার পথটা ঠিক ততোটাই ধাঁধা।
তবুও তো স্বপ্নগুলো
ভালোবেসে আগলে রাখতে হয়...
কারণ স্বপ্নগুলো ফেলে দেওয়া
অতটাও তো সহজ নয়.....

সময় এক নজরে

অচিন্ত্য সরকার
বি.এড (প্রথম সেমিস্টার)

এই মহাবিশ্বের জন্ম ১৩৮০ কোটি বছর আগে।
ধরে নিন, এটা হল মাত্র ১৩ বছর...

তাহলে, এই টাইম-স্কেলে...

মহাবিশ্বের প্রথম তারাদের জন্ম হচ্ছে মোটামুটি ১২ বছর আগে।
আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীর জন্ম সাড়ে ৪ বছর আগে।
পৃথিবীতে প্রথম এককোষী প্রাণ আসছে ৪ বছর আগে।
পৃথিবীতে প্রথম বহুকোষী প্রাণ জন্ম নিচ্ছে মাত্র ৬ মাস আগে।
ডায়নোসরেরা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ৩ সপ্তাহ আগে।

আর, হোমো স্যাপিয়েন্স সৃষ্টি হচ্ছে..... ৫০ মিনিট আগে!

মানুষ নিজে ফসল ফলাতে শিখছে ৫ মিনিট আগে।
যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ ঘটছে ৬ সেকেন্ড আগে।

দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও, আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ-সার্ত্র-হাইজেনবার্গদের আমরা পেয়েছি শেষ ২ সেকেন্ডের মধ্যে!
শেষ ২ সেকেন্ডে চাঁদে পা রেখেছে আমাদেরই মধ্যে কেউ কেউ। শেষ ২ সেকেন্ডের মধ্যে আমরা জেনেছি এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি আর সম্ভাব্য শেষের প্রায় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। শেষ ২ সেকেণ্ডের একেবারে শেষক্ষণে জন্মেছেন আপনি।

নিশ্চয়ই অ-নে-ক কিছু জানতে বাকি আছে আমাদের, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তো সময় দিয়েছেন মাত্র ২ সেকেন্ড! অতএব যে-সব ‘বই’ দাবি করে ‘সব জেনে বসে আছি’, তাদের বলুন ‘ধন্যবাদ’। ভরসা রাখুন মানুষের উপর।

ক্ষয় নয় নিশ্চয়

দেবোপম সাহা

বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

অনন্ত সময়, জীবন নয় ক্ষয়।
ধরা যায় না যদিও, ব্যবহার হয় শুধুই।
তবুও ভাঙন নিশ্চয়।
বন্ধনে মুক্তির কাঁটাতার।
নতুন কিছুর উদ্যমে তৈরি হয় পাগল।
নিষ্পাপে ছোবলের ছাপ।
ছদ্মবেশ দুপুরে মেরুদণ্ড ভাঙে।
আকাশে গ্রাস হয় কর্ণ
গণিতের ভারে চিত্ত চঞ্চল, ধৃতরাষ্ট্র দৃষ্টি ফিরে পায়।
রাষ্ট্র পায় না নিদ্রা।
হিংস্র আঁচড় হিটলারকে মারে।
তুমি নিয়তির ভিন্-দেশীয় আশ্রয়।
বিভেদের দেশে আর নয়, চলো প্রেম স্বরূপ বিপ্লব বানাই।

দিনকাল

রণতোষ ঘোষ

বি.এড (প্রথম সেমিস্টার)

ভোরের ক্লান্ত বিছানায় অবসাদের আত্মহত্যা
হরমোনে ভাসমান কামনার বীর্যপাত
এ যেন এক শাশ্বত ঘৃণা।

ফাঁসির শাস্তি পাওয়া আসামীর শেষ প্রার্থনা
তাকে ৯০ বছর বয়সে গুলি করে মারা হোক।

জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ আত্মাদের আর্তনাদ
সুর হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে নৃত্য করে।

ভগবানরুপি শয়তানের পুতুল খেলা
আমার ধর্ম সেরা, তুমি মরতে পারো
তোমার কবরে কালো গোলাপ দেব।

দর্শক নেই একাই দেখছি এসব
আমার প্রিয় লাল চেয়ার-এ বসে।

নরকের আগুন যেন জল হয়ে তেষ্টা মেটায়
আমার প্রেমিকার, ভগবান! তাকে তিনবেলা
পেটপুরে টাকা পয়সা খেতে দিও।

এই পৃথিবীর সমস্ত প্রেমিক-প্রেমিকাদের পুড়িয়ে মারা হোক
গোলাপ গাছে বিষ ছেটানোর আদেশ দেওয়া হোক।

মসলা চুরি করতে আসা লোকগুলো ফ্যাকাসে খাবার খায়
আমার দেশের সোনা হিরায় মোড়ানো ঠাকুর
ম্লেচ্ছদের পেট ভরায়।

প্রথম মাসের বেতন পাওয়া কমিউনিস্ট-এর শপিং লিস্টে
রাস্তার ভিখারিগুলো বাদ পড়ল।

প্রেমিকা আমায় জন্মদিনে এক বাক্স ভর্তি ঘৃণা, অপমান, প্রতারণা, দিয়েছিল
বড়লোক ছোটলোক-এর সংজ্ঞা শিখিয়েছিল
একটা আস্ত পরমাণু বোমা গিলে ছেলেটা উধাও হয়ে গেল।

আমার খুব টাকার দরকার।
একটা গিটার কিনবো।।

শিশুর কথা

শুভাশিস সরকার
ডি.এল.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)

পেটের আগুন নেভাতে আজ-
পিঠে নিচ্ছে শ্রমের বোঝা!
কলম, বই গুলো ব্রাত্য করে,
এই বয়সেই পাচ্ছে সাজা!

এই অন্ধকার কবে দেখবে আলো?
কবে থাকবে ওদের পিঠে বই—
কবে বন্ধ হবে পেটের খিদে!
ঠোঁটের কোণে কবে শুধু থাকবে হাসি—
যন্ত্রণা ভুলে কবে ওরা ধরবে কলম?
ওই ছোটোরাও করবে কবে
মাঠে-ঘাটে হইচই?

শূন্য ত্রিশূল

অরিজিৎ দত্ত
বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

ইতস্তত চাবুকের বুকে যন্ত্রণার মেরুতে হাসে নক্ষত্র।
ল্যাম্পপোস্টের হাঁটুতে দিয়েছে বিজ্ঞানের গলায় কাঁটা।
বুকের পৃষ্ঠায় জন্মানো হাসিতে সময়ের ঘড়ির বিষাদের বিজ্ঞাপন ক্রমশ বাতিল।
সমুদ্র স্রোতে বলি হয়েছে উষ্ণায়নের।
ক্ষুদ্র বিন্দুতে জন্মেছে মৃত্যুর নিরাপত্তা।
এটি অসুখ নয় যেখানে মরেছে পঞ্চভূত।
এর উৎস তোমার আবিষ্কারের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে হয়েছে বিলীন,
হয়েছে বিলুপ্ত শকুনের নতুন কালবৈশাখীর বিপ্লবের মতোন।
এটি সেই ত্রিশূল যেখানে নিঃশ্বাস হারিয়েছে অজস্র সৎ শাসনের।

কবি

সৌগত দাশগুপ্ত
বি.এড (প্রথম সেমিস্টার)

রবি দাদু, রবি দাদু তুমি নাকি কবি?
বাংলার ঘরে ঘরে দেখি তোমার ছবি।
লম্বা দাড়ি, তোমার মুখে
মাথায় সাদা চুল।
দাদু ভেবে তোমায় আমি করেছিলাম ভুল।
সত্যি করে তুমি আমায়
বলো দেখি দাদু।
কেমন করে কবি হলে
জানতে নাকি যাদু!

টাকা

সুপর্ণা জোয়ারদার
এম.এড (প্রথম সেমিস্টার)

টাকা! টাকা! টাকা! নেইতো ঘরে,
টাকা না থাকলে অনাহারে মরে।
মানুষের গর্ব হয়, যদি থাকে টাকা,
মন খারাপ করে যখন পকেট হয় ফাঁকা।
টাকার জন্য কি করে না মানুষ?
মানুষ খুন করে, থাকে নাকো হুঁশ।
প্রচুর টাকা থাকলে হয় সে ধনী
সমাজে তিনি হন নয়নের মণি।
টাকা কম থাকলে সে হয় দরিদ্র,
ভালো মানুষ হয়েও সে হয় অভদ্র
টাকার জন্য করছে কত মন্দ কু-কাজ
তারাই দাপট চালিয়ে থাকছে খোস মেজাজ,
যাদের টাকা নাই, থাকে ফুটপাতে,
তাদের কিবা দিন কিবা রাত তাতে।
ধনীরা শোষণ করে মাথায় পড়ে হাত,
গরীবদের রক্ষা করেন স্বয়ং দীননাথ।
টাকা থাকলে বিদেশে পড়া হয়
টাকা না থাকলে পড়া বন্ধ রয়।
সুচিকিৎসাও হয়, যদি থাকে টাকা
মানুষ মারাও যায়, যদি না থাকে টাকা।
এ জগতে টাকাই সব ; মানুষ কিছু নয়,
টাকা সব হয় না ভাই, মানুষ বড় হয়।

প্রিয় বন্ধু

সারদা কর্মকার
বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

বিদ্যালয় জীবনের সূচনা কাল থেকে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত,
—''বন্ধুত্বের বন্ধন'' প্রত্যেককে আগলে রাখে,
আমাদের জীবনে বন্ধুর কোনো অভাব থাকে না অবশ্যই....
কিন্তু সেই ''একজনই হবে তোমার অন্তরের প্রাণের বিশ্বস্ত বন্ধু''।
সহস্রাংশ মান অভিমানের মধ্যে দিয়েও সে তোমার সঙ্গে থাকবে।
জীবনে চলার পথে ভালো খারাপ সব মিলিয়ে এক ''অপরূপ সৌন্দর্যের সম্বন্ধস্থাপন'',
যে বন্ধুর জীবনকে আনন্দময় করে তোলে,
রীতিবিরুদ্ধ বা স্থানভ্রষ্ট হলে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবে সঠিক পথে প্রেরিত হতে,
তোমার ''অন্তর রুক্ষতা দূর করতে'' যে ''নিজস্ব অন্তর রুক্ষতা কে বিসর্জন দিয়ে''...
তোমাকে প্রফুল্লিত করে তোলার প্রয়াস করবে,
বন্ধু, যে তোমাকে দেখামাত্রই অনুভব করবে তোমার দ্বন্দ্ব ও মন খারাপের কারণ...

তোমার ক্রোধ বিরক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে,
কখনো অভিভাবক হয়ে পথ প্রদর্শকের কাজ করবে,

আবার কখনো সমবয়সী হয়ে ''দুষ্টুমিপূর্ণ আমোদ-প্রমোদও করবে''।
সময়ে অসময়ে সে সম্পূর্ণভাবে তোমার পাশে থাকবে,

জ্ঞাতি সম্বন্ধযুক্ত না হয়েও যে তোমার রক্তে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিত থাকবে।

MOVING WILL

Md. Rezaul Islam
B.Ed., (2nd Semester)

Structured dream, one finds,
Unfathomable path, but has to lead,
Broken system, diverted will,
Yet the unconquerable will to reach the bottom of hill.

Untrodden path, although trodden by innumerable guys,
The sun arises, glimpses the hope of joys,
Blinking the light at the corner of each province,
To grasp the light, one has to embrace One's own will.

One step further has to move, to touch the twinkling star,
Know not, what might happen but move faster,
Sometimes light dimmed, but has glorious touch,
With it needs Almighty's grace.

The sun sets, but the star marvellous,
That peeps through the drakness and become glorious.

করোনার অভিশাপ

রৌণক সেন
বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

ওহে করোনা!
মানব জগতের আর ক্ষতি কোরো না।।
তুমি আনিয়াছ মহামারী ওই চিনের হাত ধরে।
আর করিয়াছ সর্বনাশ এ ভুবনের।।

অনেক পরিবারকে দিয়েছ তুমি শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা।
সর্বনাশী মৃত্যু হয়ে করেছ সন্তান পরিজন হারা।।

তোমার কোপে ভুবনে যখন ভয়াবহ অবস্থা।
প্রধানমন্ত্রী দিল তখন লকডাউন ব্যবস্থা।।

ব্যবসায়ীদের উপার্জন যখন সব বন্ধ।
লকডাউনে তখন তাদের হাহাকার কাণ্ড।।

লকডাউনে গাড়ি ঘোড়া যখন সব বন্ধ
প্রবাসী শ্রমিকেরা তখন ভাবে
কি করে বাড়ি ফিরব।'

কেউ দিল রওনা পদব্রজে, কেউ বা স্কুটারে বাড়িতে ফিরবে পদব্রজে ধীরে ধীরে।

কিন্তু শ্রমিক ভাবে অনেকদিন পায়নি দেখা বাবা মা'র সঙ্গে।
বলে সবাই দিল হাঁটা রেলস্টেশন ধরে।।

হাঁটতে হাঁটতে যখন তারা অনেকটা পরিশ্রান্ত।
মাথায় তখন তাদের একটাই চিন্তা রেলগাড়ি সব বন্ধ।।

বলে ওঠে একজন আর পারছি না একটু ঘুমিয়ে নিই।
আগামীকাল আবার শুরু করব হাঁটা একটু জুড়িয়ে নিই।।

মূর্খ সবাই ঘুমিয়ে পড়ে ট্রেনের পাতের উপর।
মালগাড়ি এসে মেরে দিল, কেও পেল না জীবনের খবর॥

ভগবান! তাদের কি ছিল অন্যায় কেন এমনটা হল।
করোনা তাদের পরিবারকে হাহাকার করে দিল॥

ভুবনের বড়ো অভিশাপ তুমি এলে ২০২০ সালে।
ছিল না তখন ভ্যাকসিন, করলে এইরকম সর্বনাশ এই গোটা সালে॥

২০২১ সালে এসেছে ভ্যাকসিন তাও নেই রেহাই
ভ্যাকসিন নিয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছে করেছে সবাই হায়! হায়!

স্কুল খুলবে কবে?

দীপঙ্কর বর্মণ
বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

সব কিছু খুলে গেছে অফিস দোকান পাট
স্কুলটা যে কবে খুলবে?
ছোট্ট তিন্নি রাতে ভাবে শুয়ে শুয়ে
কাল ঠিক স্কুল যেতে হবে।
মা যায় ব্যাঙ্কে বাবা হাসপাতালে
মনে হয় একছুটে পালায়।
বাবা বলে মা তোকে কী করে বোঝাব
তোর স্কুলটাও যে রাজনীতি চালায়।
ঠিক সাড়ে দশটায় বাজত টিফিন বেল
মাঠে ছুটোছুটি লুটোপুটি।
দিদিমণি বলত বাকী খেলা কাল হবে
ক্লাসে ঢুকে পড় গুটোসুটি।
সেই কাল আসে না কেউ ভালোবাসে না
স্কুলটাই হারিয়ে গেছে।
রয়ে গেছে শুধু তার একরাশ গন্ধ
মনেরই আনাচে কানাচে।
বালুরঘাটের ছেলে উত্তম এসেছিল
পড়তে কলকাতায়,
কলেজ আর হস্টেল দুটোতেই তালা মারা
রোলকল নেই কোনো খাতায়।
আজ মোবাইলে ক্লাস হয় সকলেই পাশ হয়
তবুও কেউ নেই কারো পাশে।
জানে সেও ভালো করে এতশত পাশ করে
চাকরিও জুটবে না তার।
অনলাইন ব্যাচ বলে মজার খোরাক হওয়া
আজ শিক্ষার অধিকার।।

করোনাসুর

মধুমন্তী মৈত্র

বি.এড (প্রথম সেমিস্টার)

দেশের পর দেশ, শহরের পর শহর ভেসে যাচ্ছে করোনাসুরের ত্রাসে
কিন্তু তাতে কী আমরা আছি নিজেদের মেজাজে।।
প্রথম ঢেউ, দ্বিতীয় ঢেউ শেষ হয়ে তৃতীয় ঢেউ আসার জোগাড়
কিন্তু তাতে কী? অকারণে আমাদের বাইরে বেরোনো অবশ্যই দরকার।।
করোনাবিধি মেনে চলা আমাদের কাছে ফেলনা
তাইতো মানুষরূপী ভগবান ডাক্তারদের হারানো আমাদের পাওনা।।
প্রশাসন, সমাজসেবক করছে সবাই সচেতন
কিন্তু তাতে কী সামাজিক দূরত্ব মানতে আমরা অচেতন।।
ডবল ডোজেও মিলছে না মুক্তি
মাস্ক না পরার হাজারো আছে যুক্তি।।
বারেবারে হাত ধোয়া করতে হবে অভ্যাস
সবকিছু জেনেও এসব না করা আমাদের স্বভাব।।
দিনে দিনে পরিস্থিতি হবে আরও ভয়ংকর
এতকিছুর পরও ভাঙছে না আমাদের অহংকার।।
আমরা পারি না এমন কিছু নেই
তবে এমন অসাবধানে চলতে থাকলে বাঁচবো না কেউই।

আমি শিক্ষক হব

সুব্রত বর্মন

বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

ছোটো থেকে হলাম বড়ো একটাই স্বপ্ন শিক্ষক যে হব।
কিন্তু বি.এড করে এস. এস. সি.-টা কবে করতে পারব?
বন্ধ এখন এস. এস. সি. সব আইনের দ্বারে।
ভাবতে ভাবতে আসব নাতো সময়ের পারে।
বড়ো দিদি বলে আমায়, ভাই কেন করছিস বি.এড?
বাপের টাকা কি বেশি হয়েছে,
একদিন অবশ্যই ভাজবি চপ কাটলেট।
হাসিলাম আমি কি বল দিদি আমি শিক্ষক হব।
শিক্ষক হয়ে তোমার কথার যোগ্য জবাব দিব।
হাসলো দিদি কি বলিস ভাই।
পশ্চিমবঙ্গে সরকারি চাকরি যে নাই।
আমি ছিলাম প্রথম এস. এস. সি.-তে ২০১৭ সাল।
কই পেলাম চাকরি এখন আমার কি হল হাল।
প্রথম ছাড়া হইনিতো দ্বিতীয়, প্রথম থেকে এম.এ,
বি.এড করে আমার ভাগ্যখানি গেল যে থেমে।
আমি বললাম তবে কি করব দিদি কি আমার হবে?
জমি বেচে বি.এড করার ফলটা কবে পাওয়া যাবে?
দিদি বলল বেশি করিস না ভাবনা চাকরি তুই পাবি।
মাস্টারি চাকরি ভুলে যা ডাব্লু.বি.সি.এস ঘাটবি।
আরো আছে ব্রেকিং, নেট যেটা তোর ইচ্ছা।
যে কোনো একটাই ঢুকে পরবি শুরু করে দে প্রচেষ্টা।
ভালো নম্বর থাকলেও চাকরি পাবে না সবাই যদি না থাকে চেনা।
ঘুষ দিতে পারলেই হতে পারবি গেন।
সব কিছু শুনি বললাম আমি, কি করা যায়।
ঘুষ দেওয়ার জন্যে এত জমি যে আমার নাই।

এপিঠ-ওপিঠ

অন্তলীনা মহন্ত
বি.এড (প্রথম সেমিস্টার)

শ্যামবাবুর ছোটো মেয়েটা, ছাদে বসে
সেল্‌ফি তুলছে তার পোষা ম্যাঁও এর সাথে,
একটু বাদেই হোয়াট্‌সঅ্যাপে স্ট্যাটাস আপলোড—
"With my Kitty."
ক'দিন আগেই চৌরাস্তার মোড়টায়,
একটা কুকুরকে ঢিল ছুঁড়েছে যে,
হাতের ঠোঙা থেকে চিকেন স্যান্ডউইচটা টেনে নামিয়ে,
ও যে ছিড়ে খাবলে খেয়ে নিয়েছিল—

সেদিন অনিতার মা-র নাকি পড়ে গিয়ে কোমড় ভেঙেছে—
রাতে চটের গদিতে শুয়ে কাঁদে অনিতা,
মা-তো জানে মেয়ের তেমন রোজগার নেই—
তাই মুখে কাপড় গুঁজে অসহ্য যন্ত্রণাও সহ্য করে নেয়—
মায়েরা বুঝি এমনই হয়!

ছোটোবেলা গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ মানুমাসি,
ভালোবাসে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, নজরুল—
শ্যামবাবুর বাড়ি থেকে অনিতা শরৎ সমগ্র এনেছে মায়ের জন্য,
সন্ধেবেলা উঠোনে লণ্ঠন জ্বেলে পিঁড়িতে বসে মানুমাসি ডুবে যেত শরৎ সমগ্রে—
অনিতা ভেবেছিল, শ্যামকাকারা বিদেশ যাবার আগে,
আরো ক'টা বই এনে দেবে মায়ের হাতে।
মানুমাসি চটের গদিতে পাশ ফিরে শুয়ে নিঃশব্দে চোখের জল মোছে,
আবার কবে সোজা হয়ে বসে শরৎ সমগ্র পড়বে সে?
কলপাড়ে এঁঠো বাসন খুঁটে খুঁটে যায় ইঁদুর,
ওদিকে দূরে মাঠে শেয়াল ডেকে চলেছে—
বাঁশের মাথাগুলো হাওয়ায় দুলে ওঠে,
ভয়ে চোখ বন্ধ করে নেয় অনিতা।

শ্যামবাবুর বাড়িতে গোছগাছ চলছে,
ওনার ছেলে বলেছে, এই নোংরা দেশে থাকা যায় নাকি?
বোনের বিয়ে দিয়ে জাপানে চলে যাবে তারা।
এই বাড়ির কাজটা আর থাকবে না অনিতার,
ভেবেই বুকটা কেঁপে ওঠে তার।
পাশে Kitty ম্যাঁও মিউ করে সারাবাড়ি ঘুরে বেড়ায়,
একটু আগে হলঘরের মেঝেতে বমি করেছে সে,
অনিতা বমি সাফ করতে করতে ভাবে,
জাপানে বেড়ালের বমি পরিষ্কার করার—
কোনো চাকর আছে কি?

মায়ের যন্ত্রণা

শীতলী সরকার
বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

সেই সকাল থেকে সুপর্ণার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি সুমন। পাহাড় ভ্রমণ করতে গিয়েছিল সে। পাহাড় থেকে ফিরেই বোতল ও গ্লাস নিয়ে বসে গেছে বাংলো বাড়ির বারান্দায়। বীরু এসে পকোড়া, বেগুনি দিয়ে গেছে। সুবর্ণাও যেচে কথা বলতে যায়নি। কাল সকালেই ওদের ফিরে যাওয়া। মোটামুটি সব জিনিসপত্র গোছগাছ করে নেয়। হাঁটু ও কোমরের জ্বালাতন বেড়েছে সুপর্ণার। এই জন্যেই এখন বেড়ানো, ঘোরা যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে চায় সুপর্ণা। কিন্তু সুমন সে কথা শুনলে তো! এতটা বয়স হয়ে গেল, এখনও ঘোরার নেশা তার কমল না। সবাই বলে, তোদের তো কোনো পিছুটান নেই, দুটিতে ঝাড়া হাত-পা মানুষ, বেরিয়ে পড়লেই হলো।

দুটি মানুষ থাকার সুখটাই দেখছে সকলে কিন্তু সুপর্ণার যন্ত্রণাটা কেউ বোঝে না। সুমনও কখনও সুপর্ণার যন্ত্রণাটা মন থেকে বোঝার চেষ্টা করেনি। হট জল ব্যাগটা গরম করে নিয়ে গিয়ে একলা ব্যালকনিতে বসে সুপর্ণা। হাঁটুতে ও কোমরে সেঁক নিলে আরাম হয় একটু। বাংলো বাড়ির ব্যালকনি থেকে পাহাড়টার বেশ অনেকটাই পরিষ্কার দেখা যায়। বাংলোর চারপাশ গাছ দিয়ে ঘেরা। বাংলোর সামনে একটা সুন্দর ফুল বাগানও আছে। অদূরেই টোংঙা নদী দেখা যায়। ঐ নদীর ওপারে খোলা জায়গায় সল্টলেকে নুন খেতে আসে বনের পশু পাখিরা। সচারাচর গভীর রাতেই আসে পশু পাখিরা। এই বাংলোর ব্যালকনি থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। গত দু'দিনে একটাও পশুপাখি দেখা যায়নি। আজকেও পশুপাখিদের দেখা মিলবে কি-না কে জানে! আজ পূর্ণিমা একদমই নয় তবে হাল্কা আলোর ছলকে কিছুটা পূর্ণিমার মতো দেখাচ্ছে চারিপাশ। বেশ ঝলমলে চাঁদের আলোর মতো দেখা যাচ্ছে।

সুমন নিজের চেয়ারটা নিয়ে এগিয়ে আসে সুপর্ণার কাছে।

হাঁটুতে ব্যথা করছে?

কোনো উত্তর দেয় না সুপর্ণা। সুমন আবারও জিজ্ঞাসা করে বলে,

রাগ এখনও কমেনি! তুমি জানো ঐ তীরে ওরা বিষ মিশিয়ে রাখে। ওটা যদি তোমার গায়ে লাগতো কি হতো বলো তো!

আশেপাশের আদিবাসী সম্প্রদায় বনদপ্তরের নজর এড়িয়ে মাঝে মাঝেই তীর ধনুক নিয়ে পশুপাখি শিকার করতে ঢুকে পড়ে জঙ্গলের মধ্যে। আজ একটা বাচ্চা হরিণকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে যাচ্ছিল এক আদিবাসী শিকারী। সুপর্ণা সেটা দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে বাধা দেয় তাকে। তীর যদি কোনো কারণে ধনুকের ছিলা থেকে বেরিয়ে যেত, সেটা সুপর্ণাকেই লাগত।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটু বেশিই কথা বলে ফেলেছিল সুমন। পুরোটা যে সুপর্ণার কথা ভেবেই বলেছিল সেটা কি সুপর্ণা বোঝেনি! আরও কিছুটা কাছে এসে বসে সুমন। কি হলো এখনও রাগ কমেনি!

আমার কথা ভাবলে ঠিক আছে কিন্তু যদি শিকারীটাকে না আটকাতাম তবে হরিণের বাচ্চাটা যে মরে যেত! একটু উদাস ভাবেই জবাব দেয় সুপর্ণা। সুমন চুপ থাকল। বীরু এসে ঘরেই রাত্রের খাবার দিয়ে গেছে একটু আগে। খাচ্ছিল সুপর্ণা ও সুমন। দরজায় নক করার শব্দ হল, বাইরে থেকে বীরুর গলার শব্দ।

‘‘জলদি আইয়ে সাহাব, উহাসে এক হীরণ আয়ী হ্যায়’’। খাওয়া ফেলেই ব্যালকনিতে বেরিয়ে যায় সুপর্ণা ও সুমন। নদীর ওপাড়ে ঐতো দুটো হরিণ। বাচ্চা হরিণটাকে চিনতে পারে সুপর্ণা। মা হরিণটা ঘন ঘন ডাকছে। সুপর্ণার মনে হয়, সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে মা হরিণটি। কিছুক্ষণ পর, বাচ্চাকে নিয়ে পাহাড়ের জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছে মা হরিণটি। জীবনের শেষ লগ্নে এসেও একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সুপর্ণার বুক থেকে। নিজের সন্তানকে এভাবেই জড়িয়ে ধরে থাকতে চেয়েছিল সুপর্ণা। এ-জন্মে তার আর মা হওয়া হলো না। চোখ ফেটে জল ঝড়ে পড়তে লাগল সুপর্ণার।

স্নেহলতার ডায়েরি

ঋতুপর্ণা দাস

এম.এড (প্রথম সেমিস্টার)

আজ ১২ বছর বয়স হল স্নেহলতার। এমন সময় রাত ৮টা। প্রতিদিনের মতো মায়ের ঘরে রকিং চেয়ারের পাশে খোলা জানালার সামনে বসে স্নেহলতা তার মায়ের সঙ্গে কথা বলে চলেছে। আজ তার জন্ম দিনে কে কে এসেছিল? সে কী কী উপহার পেয়েছে? এই সবকিছু। হঠাৎ করে ছোট্টো স্নেহা বলে উঠল 'মা তুমি কী আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারো না?' কিছুক্ষণ পর তার মায়ের উত্তর এল, 'না তা তো আর সম্ভব নয় স্নেহা'।

স্নেহা আর তার মায়ের গল্পটা জানতে গেলে আমাদের জানতে হবে আজ থেকে ছ' বছর আগের কথা। জানতে ইচ্ছে করছে তো কী হয়েছিল ছ' বছর আগে?

স্নেহলতার মাত্র ছ' বছর বয়স। মা আদর করে তাকে ডাকতো স্নেহা বলে। মাকে জড়িয়েই দিনের অধিকাংশ সময় কাটতো স্নেহার। স্নেহার ছোট্টো পৃথিবীতে তার বাবা থাকলেও কাজের সূত্রে তার বাইরে থাকার কারণে কোনোদিনই স্নেহার সাথে খুব একটা বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল না তার।

হঠাৎ করেই ছোট্টো স্নেহার জীবনে নেমে এল সেই ভয়ানক ঘটনাটি। একটা দিনের একটা মাত্র ঘটনা বদলে দিল স্নেহার সমস্ত জীবনটা। একদিন দুপুরে মায়ের সাথে ছাঁদে কানামাছি খেলছিল স্নেহা, হঠাৎ পা পিছলে ছাদ থেকে পড়ে যান স্নেহার মা, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার।

হঠাৎ স্নেহার আলো ঝলমলে পৃথিবীটাকে ঘিরে ধরলো একরাশ অন্ধকার। মা চলে যাওয়ার পর স্নেহা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না কীভাবে থাকবে সে? কীভাবে কাটবে স্নেহার দিনগুলো মাকে ছাড়া।

ইতিমধ্যে স্নেহার বাবা বাড়িতে ফিরেছেন। খবর পেয়ে তার এক দুঃসম্পর্কের পিসিমাও বাড়িতে এসেছেন। বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও স্নেহাস্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি। ইতিমধ্যে তার বাবার বিদেশে ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে গেল। তিনি স্নেহাকে বার বার নিয়ে যেতে চাইলেও সে রাজি হল না। মায়ের বন্ধ ঘরে সে কাউকে ঢুকতে দেয় না। শুধু বন্ধ ঘরের সামনে বসে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটায়। এই অবস্থায় পিসিমার পরিবারে কেউ না থাকায় তিনি স্নেহার দেখাশুনা করার জন্য থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাবাও খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো। সকলের সামনে ভালো আচরণ করলেও একান্তে পিসিমা স্নেহার সাথে মোটেই ভালো ব্যবহার করতেন না। বাবা বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকায় এটি তার নজর এড়িয়ে গিয়েছিলো।

একদিন দুপুরে স্নেহা ও তার পিসিমা বাড়িতে একা। নানা কাজে স্নেহার বাবা এক-দু'দিন বাড়ির বাইরে রয়েছেন। রান্না ঘরের বয়াম থেকে খাবার নিতে গিয়ে বয়ামটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায় স্নেহার। আওয়াজ পেয়ে পিসিমা ছুটে এসে স্নেহাকে খুব বকাবকি করেন। খুব কষ্ট পেয়ে স্নেহা ছুটে মায়ের ঘরের সামনে গিয়ে বসে খুব কাঁদতে শুরু করল। হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ এল বাইরে কেন স্নেহা, ভিতরে আয়। আওয়াজটা শুনে স্নেহা চমকে উঠল। এতো মায়ের গলা। স্নেহা ছুটে ঘরের ভিতরে গেল।

সেই শেষদিন মা যেভাবে ঘরটা সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল নিজের হাতে আজও ঠিক তেমনি রয়েছে। সে সারা ঘরে মাকে খুঁজতে শুরু করল। বারবার বলতে থাকল 'মা তুমি কোথায়?' 'মা তুমি কোথায়?' তারপর একসময় হাঁপিয়ে গিয়ে স্নেহা মায়ের রকিং চেয়ারটার পাশে বসে পড়ল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল মায়ের টেবিলে রাখা ডায়েরিটার ওপর। জানুয়ারি মাসের ২৯ তারিখ মা শেষবার লিখেছিল। স্নেহা সেই পাতায় লিখল 'মা তুমি কোথায়?' কিছুক্ষণ পর উত্তর এল 'আমি তো তোর কাছেই আছি।' সে চমকে উঠল এও কি সম্ভব। সে আবার লিখল 'তুমি সত্যিই আছো'? আবার উত্তর এলো 'এই তো আমি তোর কাছেই আছি।' স্নেহা ব্যস্ত হয়ে আবার লিখলো 'পিসিমা আমার সাথে কেমন করে তুমি দেখছ? আমি খুব কষ্ট পেয়েছি। আমি একদম ভালো নেই মা।' আবার ডায়েরির পাতায় মায়ের হাতে লেখা উত্তর ফুটে উঠল 'আমি জানি তুই ভালো নেই, আর চিন্তা করিস না আমি চলে এসেছি তো, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।' তারপর আরো বেশ কিছুক্ষণ স্নেহা ও তার মায়ের কথা চলল। তারপর স্নেহা মায়ের কথায় ঘর বন্ধ করে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। পড়দিন সকালে পিসিমা আবার নানা কারণে স্নেহাকে বকাবকি করতে শুরু করলে হঠাৎই সেই সময় স্নেহার বাবা বাড়িতে ফিরে এলেন। স্নেহার প্রতি পিসিমার ব্যাবহার তার চোখে পড়ল। তিনি স্নেহাকে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে তাকে চুপ করালো।

হঠাৎ বাবাকে দেখে স্নেহা প্রশ্ন করল তোমার তো কাল ফেরার কথা, তুমি আজ ফিরলে কেন? বাবা উত্তর দিলেন 'কেন আশু যে আমাকে ফোন করল, বাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরো, পিসিমা তোকে খুব বকাবকি করছে। সেই কথা শুনেই তো আমি সবকাজ ছেড়ে ফিরে আসলাম মা।

স্নেহা চমকে উঠলো আশুদা ফোন করেছে? কিন্তু আশুদা তো আজ.....?'

সেদিন সকালেই আশুদা বেরিয়ে পড়েছিল গ্রামের বাড়ি যাওয়ার জন্য, তার তো এসব কথা জানারই কথা নয়।

এরপর স্নেহার বাবা আর কোনো দিন বিদেশে যাননি। পিসিমাকেও তীর্থে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর আজ ছ' বছর কেটে গেছে। একইভাবে স্নেহা আর তার মায়ের কথা হয় ডায়ারির ২৯নং পাতায়।

আজ স্নেহার বারো বছরের জন্মদিন। মার সাথে স্নেহার প্রতিদিন কথা হয়। আজ শেষ বার মা বলল, 'স্নেহা, তুমি এখন বড়ে হয়েছো। তুমি এখন ভালো আছো। আজ আমি যাই'। এরপর হঠাৎ ডায়ারি বন্ধ হয়ে যায়।.....

মাস্টারমশাই

সুমিত্রা আচার্য
বি.এড (প্রথম সেমিস্টার)

তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র অজয়! মেধাবী ছাত্র। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অত্যন্ত প্রিয়। বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক-মহাশয় বিদ্যালয়ের প্রতিটি বাচ্চাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তার মধ্যে অন্যতম অজয়। ক্লাসে অজয় অন্যান্য বাচ্চাদের তুলনায় একটু বড়ো। তার সাবলীল ব্যবহারের জন্য ক্লাসের সবাই তাকে ভালোবাসত। সে একটি আদিবাসী পরিবারের ছেলে। বাবা বেঁচে নেই। মা শ্রমিকের কাজ করে ছেলেকে নিয়ে খুব দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে দিনাতিপাত করতেন। তার মা খুব সকালে সামান্য কিছু রান্না করে ছেলের জন্য ঢেঁকে রেখে নিজের জন্য কিছুটা নিয়ে সারা দিনের জন্য বেরিয়ে পরতেন। এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ কয়েক দিন ধরে দেখা যায়, অজয় ক্লাসে খুব অমনোযোগী। সে আর আগের মতো শিক্ষকমশায়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না। কয়েকদিন বিষয়টি লক্ষ্য করার পর তিনি অজয়কে অত্যন্ত স্নেহের সাথে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "বাবা, কি হয়েছে তোর?" অজয় কোনো উত্তর দেয় না, ছল ছল চোখে শুধু শিক্ষক মশায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

পরের দিন থেকে তাকে আর বিদ্যালয়ে দেখা যায় না। অজয়ের সহপাঠিদের কাছে তার না আসার কারণ জানতে চাইলে তারা জানায়, "অজয়কে তার মা সঙ্গে করে কাজে নিয়ে গিয়েছে। ও আর পড়বে না। ওর মা রোজ বাড়ি ফিরে ওকে প্রতিদিন খুব মারে, কারণ আমাদের গ্রামের কারো কিছু চুরি হলে তারা অজয়ের নামে দোষ দেয়। সেটা শুনে রেগে গিয়ে ওকে মারে।" শিক্ষকমশাই খববরটা শুনে খুব কষ্ট পান।

এইভাবে তিন চার দিন যাওয়ার পর ক্লাসে পড়ানোর সময় হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে এক ঝলক অজয়কে তিনি দেখতে পান। তারপর জানালা দিয়ে একটা সাদা কাগজে মোড়া কিছু তার পায়ের কাছে এসে পরে। তিনি দৌড়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন কিন্তু অজয়ের দেখা পেলেন না। তাই ঘরে ফিরে এসে কাগজটিকে কুড়িয়ে নিয়ে দেখেন সেটি একটি চিঠি। তাতে লেখা রয়েছে, 'মাষ্টারমশাই, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। এই পৃথিবীতে তোমার মতো কেউ আমাকে ভালোবাসে না। সত্যি বলছি মাষ্টারমশাই আমি চোর নই!" চিঠিটি পড়ে মাষ্টারমশায়ের দু'চোখের পাতা বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে অজয়ের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ একজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। অজয় তার মাষ্টার মশায়কে দেখে লুকিয়ে পরে। তার মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তার অসুস্থতার জন্য সেদিন তার কাজে যাওয়া হয়নি। মাষ্টারমশাই অজয়ের মাকে বুঝিয়ে বলেন অজয়ের মেধা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। সঙ্গে বলে সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্ব কর্তব্য কি! তারপর অজয়কে কাছে ডেকে অনেক আদর করে বললেন—" কাল থেকে স্কুলে আসিস বাবা। তোকে অনেক বড় হতে হবে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে, যারা তোকে নিয়ে খারাপ কথা বলছে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, তুই ভালো ছেলে।"

অজয় আসলে মা-বাবা ভালোবাসা সেইভাবে কোনো দিনও পায়নি। সে তার মাষ্টারমশায়ের মধ্যে বাবাকে খুঁজে পেত। তাই মাষ্টারমশায়ের টানেই সে আবার বিদ্যালয়মুখী হয়। মাষ্টারমশাই তাকে সব সময়

ওর লেখাপড়া, খেলাধুলা প্রভৃতি সব কজে উৎসাহিত করতে থাকেন এবং বড়ো হওয়ার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেন। অজয় তাতে উদ্বুদ্ধ হয়।

এর কিছুদিন পরে প্রতিবারের মতো এবারেও অজয় প্রথম স্থান পেয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ওঠে। মাষ্টারমশায় খুব খুশি হলেন, কিন্তু অজয়ের মন ভারাক্রান্ত, কারণ মাষ্টারমশায় আর বেশিদিন নেই এই স্কুলে। উনার বদলির দিন খুব কাছেই।

যথারীতি তার বদলির দিন এল। ছাত্র-ছাত্রীরা যে যার মতো ছোটো ছোটো উপহার নিয়ে এসেছে। অজয়ও এর ব্যতিক্রমী নয়। যে তার প্রাণপ্রিয় মাষ্টার-মশায়ের জন্য কতকগুলো ফুল একত্র করে একটি সুন্দর ফুলের তোড়া বানিয়ে এনেছে। মাষ্টারমশাই সব উপহারগুলোর মধ্যে থেকে অজয়ের উপহারটিকে প্রথমে হাতে তুলে নিলেন এবং বার বার তার সুগন্ধ নিতে থাকলেন। তারপর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উপহার-গুলো একে একে হাতে তুলে নিয়ে সব ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে পড়াশুনার গুরুত্ব বুঝিয়ে বললেন। সব শেষে স্কুল ছেড়ে যাওয়ার আগে অজয়কে কাছে টেনে নিয়ে পড়াশুনা করে বড়ো হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে গেলেন।

দীর্ঘ পনের বছর পেরিয়ে গেছে। মাষ্টারমশাই অবসর নিয়েছেন। এর মধ্যে অজয়ের সাথে তার কোনো যোগযোগ নেই। মাষ্টারমশাই হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পরলে তাকে বাড়ির লোক একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করেন। সেদিন রাতে তার একটি অপারেশন হয়। তাকে কেবিন দেওয়া হলে বাড়ির লোককে তার সাথে দেখা করে রাত্রে সেখান থেকে চলে আসতে হয়, কারণ কেবিনে রাত্রে বাড়ির কাউকে থাকতে দেওয়া হবে না। কিছুক্ষণ পর থেকে অপারেশনের অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ছটপট করছেন এমন সময় একজন সুঠাম চেহারার বছর ২৫/২৬ বছরের যুবক মাষ্টারমশায়ের কেবিনে এসে তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে তাকে বললেন, ''মাষ্টারমশাই, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে?'' কোনো সারা না পেয়ে তিনি মাষ্টারমশায়ের আরো কাছে এগিয়ে এসে আবার বললেন, ''আমায় চিনতে পারছেন মাষ্টারমশাই?'' মাষ্টারমশাই চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিন্তু চিনতে পারেন না। তখন যুবকটি তার হাত বাড়িয়ে মাষ্টারমশায়ের একটি হাত নিজের মুঠিতে ধরে বলে উঠলেন, ''আমি অজয় মাষ্টারমশাই, আপনার ছাত্র। আমি আজ আপনার আশীর্বাদে এই নার্সিং হোমের ম্যানেজার হয়েছি। আপনার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখতে গিয়ে আপনার নামটা দেখেই কেবিনে এসে আপনাকে দেখতে পাই।''

অজয়ের কথা শুনে অজয়ের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার শিক্ষক জীবনের জ্বলন্ত সার্থকতাকে তার সম্মুখে মূর্ত হতে দেখে তার দুর্বল হাতে অজয়ের হাতটাকে আরো জোড়ে চেপে ধরলেন আর তার দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে থাকে।

সূর্য কেন লাল দেখায় উদয় ও অস্তে?

মুন্না কর্ম্মকার

এম.এড (প্রথম সেমিস্টার)

ঠাম্মি বলল—রাই, ওঠ ওঠ, ভোর তো হল। দ্যাখ দ্যাখ সূর্য উঠছে। কী লাল! ঠিক যেন মায়ের কপালে এত বড়ো টিপ!

ঘুম থেকে উঠে রাই বাবার কাছে গেল—বাবা সূর্য কেন হয় লাল? এই সাত সকালে ছেলের প্রশ্নে বাবা তো মহা চিন্তায় পড়লেন। হ্যাঁ ঠিকই তো! সকালের সূর্য কেন লাল? বিকেলে অস্ত যাবার সময়ও তো লালই দেখায়, ছোট্ট সন্তানকে সঠিক উত্তর দিতে বাবা দ্বিধান্বিত। পরে জানাবো, বলে বাবা আপাতত রেহাই পেলেন সন্তানের হাত থেকে।

সেদিন সকালের পড়া সেরে অতি দ্রুত স্নান-খাওয়া সেরে স্কুলে পৌঁছলো রাই।

তৃতীয় পিরিয়ডে ভৌতবিজ্ঞানের ক্লাস, প্রিজমের ভেতর দিয়ে আলোর প্রতিসরণের ক্লাস। রাই সুযোগের অপেক্ষায় আছে। ক্লাস শেষ হবার আগেই রাই-এর প্রশ্ন—স্যার একই সূর্য সকালে লাল, দুপুরে রঙ-বিহীন আবার সন্ধ্যায় ডোবার আগে লাল দেখায় কেন?

চোখা প্রশ্ন শুনে স্যার তাকালেন রাই-এর দিকে। বাঃ দারুণ প্রশ্ন করেছো তো! ক্লাসে সবাই তাকিয়ে রাই-এর দিকে।

স্যার বললেন—আসলে সূর্য থেকে যে আলোক-রশ্মি আসে তা বিভিন্ন রং-এর ঢেউ (তরঙ্গ) খেলে এবং তারপর এসে পৌঁছায় আমাদের চোখে। এই তরঙ্গ কোনোটা বড়ো, কোনোটা মাঝারি আবার কোনোটা খুব খুদে। এই পৃথিবীটা যে গোলাকার—সে তো আমরা জানি। আর এও জানি, এর গা ছুঁয়ে আছে কয়েক কিমি পুরু ঘন বায়ুমণ্ডলের (ট্রপোস্ফিয়ার) স্তর।

পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে ভোর সকালে বা সন্ধ্যায় (সূর্য ডোবার মুহূর্তে) যখন সূর্যকে আমরা দেখি, তখন সূর্যের আলোক-রশ্মি দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আমাদের চোখে পৌঁছায়। এই আসার পথে (দীর্ঘ ঘনমণ্ডল) কর্ম দৈর্ঘ্যের আলোক তরঙ্গ (বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা)-গুলো বাতাসে ভাসমান ধুলিকণা, কার্বণ কণা, বাতাসের প্রধান 2 টো উপাদান নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন ছাড়াও এরোসলস্‌গুলোর সঙ্গে সংঘর্ষে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে খুদে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো চোখে এসে পৌঁছায় না। বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি সব বাধা পেরিয়ে আমাদের চোখে এসে পৌঁছাতে পারে। তাই সকালে উদয়কালীন এবং বিকেলে অস্তকালীন সূর্যকে আমরা সবাই লাল দেখি।

কিন্তু, দুপুর বেলায় তো লাল দেখি না? তার কারণ, তখন সূর্যালোককে নূন্যতম বায়ুস্তর পাড়ি (ভেদ করে) দিয়ে সব ধরনের (VIBGYOR) আলোক রশ্মিগুচ্ছ আমাদের চোখে পৌঁছায়। এই সব ধরনের (আকাশি থেকে লাল) একসঙ্গে বর্ণহীন দেখায়। তাই দুপুরের সূর্য লাল মনে হয় না।

রাই সহ ওর বন্ধুরা মনোযোগ সহকারে স্যারের কাছে সব কথা শুনে বেশ খুশিই হল সেদিন।

চরৈবেতি

বিট্টু রায়

এম.এড (প্রথম সেমিস্টার)

'চরর্ণ বৈ মধু বিন্দতি' ও 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'—এই কথা দুটি সত্যিই অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু বর্তমানে আমরা কেমন যেন দিকহারা নাবিকের মতো হয়ে গিয়েছি। আমরা নিজেরাও জানি না আমরা কী চাই? কিন্তু সময়ই আমাদের বলে দিয়ে যায় কি করা উচিৎ। এই সময়ের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হয় মানুষের জীবনের পরিবর্তন। এমন করেই দিবারাত্রি হয়। আর একটি দিনের সূচনা হয় পাখির কলতান ও নব সূর্যের নব কিরণের সোনালি দীপ্তি দিয়ে।

সেই রকম একটি নতুন দিনের কথা বলতেই আমার এত শব্দ ব্যয় করা। অনেকে বলেন—সকাল দেখেই নাকি বোঝা যায় সেই দিনটি কেমন যাবে—কিন্তু সেটা অবাস্তব। নিজের দাঁতকেই ভরসা করা যায় না কখন যে নিজের জিভকেই কামড় দেয়। আর সকাল দেখে সারাদিনকে বোঝা তো অনেক দূরের কথা।

সেদিন মালদা যাবো বলে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুত হয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। যথারীতি বাসেও চড়ে বসলাম। উঠে দেখি সবার মুখ কেমন যেন ঘুষ না পাওয়া দারোগার মুখের মতো গম্ভীর মনে হল। এও বুঝতে পারলাম সবাই পাশাপাশি থেকেও যেন সবাই কয়েকশো মাইল দূরে বসে আছে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। সেদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে পাশে বসা সহযাত্রীটির সঙ্গে কথা বলে একটা খবরের কাগজ পড়তে লাগলাম। বাসটি যেতে যেতে হঠাৎ 'ক্যাঁচ' শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়ল নতুন যাত্রি তোলার জন্য।

কিছুক্ষণ চলার পর একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তৎক্ষণাৎ পিছনে ঘুরে দেখি একটি ছোট ছেলে তার মায়ের কোলে কান্না করছে। বয়স আন্দাজে মনে হল বছর পাঁচ-এর বেশি হবে না। সেই ছোট্ট ছেলেটির পরনে ছিল ঢোলা জামা, দেখে মনে হল ছোট বালিশ-এ বড় কভার পরিয়ে দিলে যেমনটি হয় ঠিক তেমনি। আর তার মায়ের পোশাকও খুব সাধারণ। হাতে শুধু একটি নাইলন ব্যাগ। আমি কান্নার কারণটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার চারপাশে ভদ্র বাকল পরিহিত সহযাত্রিরা বসে আছেন। তাদের কানে এই ছেলেটির কান্না হয়তো পৌঁছায়নি বা হতেও পারে শুনেও শুনছে না, বোঝা বড় মুশকিল। মানুষ তো—!

কিছুক্ষণ পর কান্নারত সেই ছোট্ট ছেলেটির কথা কানে এল—'আম্মা, পানি খামু', 'আম্মা পানি খামু' কিন্তু মা-টি নিরুপায়, কারণ তার কাছে সেই ছেলেকে পান করানোর মতো জল ছিল না। সে চারিদিকে চাতক পাখির মতো চেয়ে চেয়ে দেখছে। কিন্তু আশেপাশের সবাই মোবাইল-এ ব্যস্ত। এই বস্তুটিকে দেখলে আমার খুব হিংসা হয় ও রাগও ওঠে। মোবাইলকে মানুষ অনেকটা সন্তানের মতো ভালোবাসে। এর কিছু দৃষ্টান্ত এইরকম—নিজের খাওয়া না হলেও তাকে চার্জ অবশ্যই দেবে, নিজে বৃষ্টিতে ভিজেও তাকে আগলে রাখবে, আর যদি কখনো হাত থেকে পড়ে যায় তাহলে তো জলের মাছকে ডাঙ্গায় তোলার মতোই অবস্থা হয়ে ওঠে।

বাচ্চাটির কান্না তখনও বর্ষাকালের ব্যাঙের ডাকের মতো শোনাচ্ছে। আমি এবার উঠে গিয়ে আমার জলের বোতলটা দিলাম এবং সাথে সাথেই ছেলেটির তৃষ্ণা ঠিক যেন সাহারা মরুভূমির মতো শুষে নিল বোতলের জলটা। জল খেয়ে ছেলেটি যতটা না তৃপ্তি পেল, ছেলেটির মা যেন আরও বেশি তৃপ্তি পেল। ঠিক যেমন —অনেকক্ষণ জলে ডুবে থাকার পর উঠলে যে স্বস্তি পাওয়া যায়, সেই মায়ের চোখ মুখ দিয়ে যেন সেই স্বস্তিটাই প্রকাশ পেল। তখনও সবাই ব্যস্ত মোবাইলে। আমি এবার চারিদিকে চেয়ে রইলাম এবং ভাবতে লাগলাম—মানুষ ও অমানুষ চেনা বড় মুশকিল, কেননা অমানুষ গুলোও তো মানুষের মতোই দেখতে।

মুর্শিদাবাদের ভ্রমণ কাহিনী

শিল্পা সাহা
বি.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

বাঙালি যেমন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, তেমনি কোনও ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির মন সবসময়ই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাঁধন ভেঙে মুখোমুখি হতে চায় নতুন কোনো সাংস্কৃতিক জগতের। আর পৃথিবীর সংস্কৃতি কিংবা ঐতিহ্য উভয়ই প্রোথিত থাকে অতীত ঐতিহ্যর অন্তঃস্থলে।

মনে আনন্দময় অনুভূতির সঞ্চার করা ছাড়া জীবনে ঐতিহাসিক ভ্রমণ-এর তাৎপর্য আছে। এই নিদর্শনগুলো ইতিহাসের সাথে মানুষের পরিচয় ঘটানোর মাধ্যমে অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করে। ঐতিহাসিক ভ্রমণে মানুষ ইতিহাসকে হাতে ছুঁয়ে দেখে। আমি কোনো ঐতিহাসিক স্থানে বেড়াতে গেলেই আপন কল্পনার স্রোতে ভেসে পৌঁছে যাই অতীতের সেই দিনগুলোতে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে মুর্শিদাবাদ-এর কথা। আর আমার গন্তব্য ছিল এক রাজ-ঐশ্বর্যে মুর্শিদাবাদ। হ্যাঁ, মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে আরম্ভ করে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা পর্যন্ত বাংলার নবাবদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে যেখানে। আমরা মুর্শিদাবাদ পৌঁছালাম ট্রেনে করে। স্টেশন হাজার-দুয়ারীর আদলে তৈরি করা। স্টেশন থেকে হোটেল যাওয়ার জন্য টাঙ্গা নেওয়া হল।

মুর্শিদাবাদ ভ্রমণের কথা শুনলে সবার আগে মাথায় আসে 'হাজারদুয়ারী' দর্শন। ভাগীরথী নদীর তীরে ৫১ একর জায়গা নিয়ে এই বিশাল প্রাসাদ। ১০০০টি দরজা সুসজ্জিত থাকার কারণে এর নাম হাজারদুয়ারী।

মুর্শিদাবাদ থেকে কয়েক কিমি দূরে অবস্থিত এটি মূলত মুর্শিদাবাদের নাম করা ব্যবসায়ী 'জগৎ শেঠ'-এর বাড়ি। এই বিশাল প্রাসাদটিতে এমন কিছু দেখা যায় যা সাধারণ মানুষের মনে বিস্ময়ের উদ্বেগ তৈরি করে।

'মতিঝিল' আসলে ছিল একটি প্রাসাদ ও ঘোড়াকৃতি হ্রদের মিলিত সৌন্দর্য। বিখ্যাত ঘসেটি বেগম-এর স্বামী নওয়াজেশ মহম্মদ এই সুন্দর ঘোড়াকৃতি হ্রদ এখানে খনন করেছিলেন।

মুর্শিদাবাদের আরও একটি দর্শনীয় স্থান 'কাতরা মসজিদ'। এই মসজিদটি ১৭২৪ সালের মুর্শিদকুলী খানের একজন অনুগামী মুরাদ ফারাশ খান দ্বারা নির্মিত এবং মুর্শিদকুলি খানের ইচ্ছানুযায়ী তাকে মসজিদ প্রবেশের পূর্ব দিকের সিঁড়ির নীচে সমাধি দেওয়া হয়।

এছাড়া সিরাজ-উদ্-দৌলার সমাধি, রানী ভবানীর তৈরি চারিমন্দির, জগদ্বন্ধু ধাম, কিরীটেশ্বরী মন্দির, আজি মুন্নেসার সমাধি ইত্যাদি আরও বহু ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান আছে মুর্শিদাবাদে।

মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ ভালো লাগার জন্য ইতিহাসের ছাত্রী হবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ইতিহাসকে সম্মান করার প্রয়োজন আছে। ইতিহাস কিংবা ঐতিহাসিক কোনো স্থান পর্যবেক্ষণ বা ভ্রমণ আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

সিকিম ভ্রমণ

অপূর্ব সরকার
ডি.এল.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)

আমি আর আমার একজন বন্ধু সিকিম ঘুরতে গিয়েছিলাম। সিকিম হল পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী শান্তিপূর্ণ রাজ্য। সিকিম রাজ্যটি পুরোটাই পাহাড় দিয়ে মোড়ানো।

আমি গত ইংরেজি মাসের ২৮/১০/২০২১ তারিখে সিকিম ঘুরতে গিয়েছিলাম। আমি বালুরঘাট থেকে ২৭/১০/২০২১ তারিখে রাতের বাসে চেপে শিলিগুড়ি পৌঁছালাম ২৮/১০/২০২১ তারিখ ভোরবেলা। তারপরে শিলিগুড়ি থেকে ভাড়া গাড়িতে করে সিকিমের (গ্যাংটক) উদ্দেশে রওনা দিলাম। গ্যাংটকে পৌঁছে সেখান থেকে ট্যাক্সি করে আমরা হোটেলে গেলাম, হোটেলটি আমাদের ট্যাক্সি চালকই নিয়ে গিয়েছিল। হোটেলটি ছিল গ্যাংটকের জনপ্রিয় বাজার মহাত্মা গান্ধী মার্গ (এম.জি. মার্গ)-এর পেছনের দিকে। সেই হোটেলের পাশে খাবার হোটেলে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। এই হোটেল থেকেই আমরা নাথুলা (১ দিন), নর্থ সিকিম (৩ দিন-২ রাত) (থাকা ও খাওয়া প্যাকেজে) এবং গ্যাংটক (১ দিন) ঘোরার প্যাকেজ বুকিং করলাম ভাড়া গাড়িতে। তারপরে সন্ধ্যা বেলা এম.জি. মার্গ-এ ঘুরে রাতের খাবার কিনে হোটেলে পৌঁছে গেলাম।

২৯/১০/২০২১ তারিখে সকালবেলা বেরিয়ে পড়লাম নাথুলা যাবার জন্য। নাথুলা যাবার পথে কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড় দেখলাম। তারপর সেখান থেকে চলে গেলাম নাথুলা। নাথুলা ১৪,১৪০ ফিট উপরে অবস্থিত। এটি হল ভারত ও চীনের বর্ডার। নাথুলার চারিদিকে শুধু পাহাড়। তবে যেহেতু এটি অনেক উঁচুতে সেই কারণে অনেকের শ্বাসকষ্ট হয়েছিল তখন তারা কর্পূর শুঁকছিল। সেখান থেকে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড় দেখলাম। মেঘের চাদর মুরি দিয়ে দূরে বসে আছে। তারপরে সেখান থেকে চলে আসলাম বাবা হরভজন সিং-এর মন্দির। সেখানে বাবা হরভজন সিং-এর মন্দির দেখলাম। সেখানে একটি বাবা মহাদেব-এর মূর্তি দর্শন করলাম। তার পাশেই ছিল খুব সুন্দর একটি ঝর্না। সেখান থেকে চলে এলাম ছাঙ্গু লেক। সেখানে ইয়াক চরে ঘুরলাম। সব জায়গা ঘোরার পরে দুপুরের খাবার খেয়ে হোটেলে চলে আসলাম।

৩০/১০/২০২১ তারিখে সকালবেলা হোটেলের টাকা দিয়ে ঘর ছেড়ে দিয়ে নর্থ সিকিমের জন্য বেরিয়ে পড়লাম ১০টার সময়। নর্থ সিকিম যাওয়ার সময় দুপুরের খাবার খেলাম একটি হোটেলে যেটি ছিল প্যাকেজের মধ্যে। সেই দিন সারাদিন গাড়িতেই কেটে গেল। যেতে যেতে ২টা বড় বড় ঝর্না দেখলাম। শেষমেস রাত ৮টা নাগাদ পৌঁছলাম লাচেন। সেখানেই রাতের খাবার খেলাম। খুব ঠান্ডা লাগছিল। সেখানে প্রায় 6°C তাপমাত্রা ছিল। ৩১/১০/২০২১ তারিখে সকালবেলা কিছু খাওয়াদাওয়া করে বেরিয়ে পরলাম গুরুদনগমার লেকের উদ্দেশে। সাদা বরফে মোড়ানো পাহাড় দুইদিকে তার মাঝ বরাবর রাস্তা ধরে পৌঁছালাম গুরুদনগমার লেক। গুরুদনগমার লেক হল প্রায়

১৮০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত আক্তি লেক। চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। সেখানে নিচে তাকালে সাদা বরফ আর ওপরে তাকালে নীল আকাশ, একদম মেঘ মুক্ত আকাশ। গুরুদনগমার লেক অনেক উচ্চতাই হওয়ার জন্য শ্বাসকষ্ট হয়েছিল তখন আমি কর্পুর শুঁকছিলাম। কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পরেছিল, তাদের আর্মি হাসপাতালে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রওনা দিলাম কালা পাত্থার দেখার জন্য। যদিও কালা পাত্থার যাওয়ার জন্য আমাদের আলাদা করে টাকা দিতে হয়েছিল। কালা পাত্থারের পাহাড়গুলো কালো পাথরে আবৃত। সেখান থেকে পুনরাই লাচেন হোটেলে পৌঁছে সেখানে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করে রওনা দিলাম লাচুং-এর উদ্দেশে। লাচেন থেকে রাত ৯টা নাগাদ লাচুং-এর হোটেলে পৌঁছে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ১/১১/২০২১ তারিখে সকাল বেলা সকালের খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম জিরো পয়েন্টের উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে খুব মজা করলাম। বরফ নিয়ে অনেক খেলা করলাম। যদিও এখানে যাওয়ার জন্য আমাদের আলাদা করে টাকা দিতে হয়েছিল। অনেকক্ষণ সেখানে থাকার পরে রওনা দিলাম ইয়াংথাং ভ্যালী দেখার জন্য। সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে গ্যাংটকের উদ্দেশে রওনা দিলাম। গ্যাংটক পৌঁছে হোটেলে প্রবেশ করলাম।

২/১১/২০২১ তারিখে ঘুরতে বেরলাম গ্যাংটকের কিছু দার্শনিক স্থান দেখতে। যেমন—তাশি ভিউ পয়েন্ট, হানুমান মন্দির, গণেশজির মন্দির—এছাড়াও আর অনেক দার্শনিক স্থান। ঘুরাঘুরি শেষ করে খাওয়া দাওয়া করে ফিরে আসলাম হোটেলে। সন্ধ্যা হতেই ঘুরতে বের হলাম এম.জি. মার্গে। সেখানে গিয়ে কিছু জিনিস কেনাকাটা করে কিছুটা সময় কাটিয়ে রাতের খাবার নিয়ে হোটেলে চলে আসলাম।

৩/১১/২০২১ তারিখে হোটেল ছেড়ে দিয়ে গ্যাংটক শহরকে বিদাই জানিয়ে রওনা দিলাম শিলিগুড়ি-এর উদ্দেশে। গ্যাংটক থেকে দুপুর ১২টার সময় রওনা দিলাম। দুপুরের খাবারটা পথের একটি হোটেলেই সেরে নিলাম। তারপর বিকেল ৫-টার দিকে শিলিগুড়িতে পৌঁছালাম। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে বালুরঘাটের গাড়িতে উঠে গেলাম (আমাদের বাসের টিকিট আগে থেকেই করা ছিল)। তারপর ৪/১১/২০২১ তারিখে ভোরবেলা বাড়ি পৌঁছালাম।

TRAVELOGUES
AN AMAZING HILL JOURNEY

Moumita Sarkar

B.Ed., (2nd Semester)

India is a warm country with very high temperatures during April, May and June. Everybody wants to escape the blazing heat to refresh. Visiting a hill in the summer day is the best from the scorching heat. I was always told that hills are the real beauty of the nature.

I had a huge opportunity to go for an amazing journey with my family and my friends. Darjeeling has been on our wish list for a very long time. Now, it was locked as our destination this summer. My entire family was excited about this trip. I travelled from Balurghat to Siliguri by a night bus. I set off my journey on Friday at 8 P.M. I came to bus stand with my uncle, aunt and brother. My friends were waiting for me with their luggages. When we reached Siliguri we took a mini car to go to Darjeeling.

Our tour to Darjeeling was a tour of three days. Since we could not take more days off from our busy schedule. In this journey we enjoyed a lot. We saw tea gardens, army barracks, lots of places and many monkeys on my way. We got down at Kurseong to complete our breakfast with some delicious foods like Roti, Sambar, Cookies etc. I noticed waterfalls, many unknown trees, local people and some of hill dogs through the car window.

We all reached Darjeeling around 9 A.M. Then we checked in at our hotel. Our room in the hotel was huge and had a breathtaking view. We got ourselves some rest and in the evening, planned to go shopping and explore the Mall market. The very famous Mall road was hustling and bustling with the large number of people.

In the early morning we woke up at 4 A.M. and got ready to go to Tiger Hill by our mini car. Tiger Hill is the pinnacle of Ghoom, the highest reailway station of India and it is famous for its sunrise view over the Himalayas. Unfortunately, the weather was very bad. The sunrise came quite fuzzy. But after a while the sun rose and some tourrists enjoyed it very well. Some native people were selling tea or coffee for tourists. I noticed that most of them are women. They were very hardworking.

Then we went to Buddha temple and Rock garden. The Buddha temple was the most peaceful place. There I saw the two major religions like Hinduism and Buddhism. We talked

to some monks about the history of the temple. In the meantime, the prayer started, as a regular religious programme. We also joined the prayers and got an opportunity for introspection. Then we got in the car for the down hill.

All day long my uncle kept bringing us hot tea, momos, snacks etc. My younger brother clicked some pictures of nature. I sat by the window side and enjoyed the beautiful green hills. The local people were passing by. The climate of this place is generally harsh with the drop of temperature between day and night. For this climate the local people have genetically been adapted to the low levels of oxygen. They suffered very hard with many problems.

The very next morning we set off for another spot. We reached the zoological park. We were fascinated to find imperilled animals such as beautiful hill birds, black pandas, red pandas, Himalayan leopards, snow leopards, Royal Bengal Tigers etc. Then we went to the tea plantation. It was all foggy. We visited one of the tea estates and tasted. It was the best cup of tea I had ever.

The immigrants of this place speaking different dialects. They created a mixed culture. They celebrated Orange festival which also attracted the tourists. This fest took place in our heart. In Darjeeling, the local folk dance impressed me very much. They wore colourful dresses which attracted our eyes to them, then we returned to our room and rested.

The next morning, we had our breakfast and packed our luggages. It was the time for our journey back. The twist and turn roads gave us an opportunity to the view of the beautiful nature from different types of angles. The journey came to an end on the fourth day. It was an amazing journey which I still have in my memory. I wish I could go on a trip like that.

This was a memorable journey for me. The journey was mind exciting and eye-catching. It gave me immense joy and stirred my imaginative mind. I came to understand the value of travelling and its educative significance. It was a new experience and a novel stimulus for me. What the journey taught me is that imagination is sweet but reality is educative and enriching.

A JOURNEY TO T21

(A Sci-fi Short Story)

Subham Kumar Mandal

B.Ed., (2nd Semester)

When I am writing this anecdote, we have already completed a day. I feel proud to be the captain of the successful team of this amazing discovery that will definitely make way to a great advancement and will ensure our survival in the long-run.

The Sun was shining bright, clearly visible from the corner of the small hill that came first into my sight. Land! Finally, a piece of Land! I was about to shout with joy but my throat didn't permit it. It seemed to be water-logged and definitely some internal damage due to the salinity of the water. I looked around. George it was. Sitting straight, hands up, eyes closed. He too is recovering from the injuries. Emily came running towards us. She had a map in her hand. She was joyous. "We made it", her eyes glazed. She seemed to be alright. Not even a small bruise can be *seen* anywhere.

Most of us didn't survive. I tried to communicate with others. Roy, Williams, Samantha and Deep, none was reachable. When our craft entered this planet, it was welcomed by fire. It took over all the craft and in no time, it scattered into pieces. *George,* Emily and me are the lucky ones to survive this warm welcome and it seemed that we have accidentally made it to our destiny. It took 831 hours to reach here.

I took a look at the temperature and all the other necessary checklists. The temperature read 35 degrees, oxygen was 25% and the rest was almost full of nitrogen. Pretty same with our place. I sent a message to George "Let's open the lid", he too was taking a look at some metrics. Emily too confirmed and we opened our face lids. It is a great achievement. Being a self-made creature, we have managed to come so far successfully to a different planet where survival is a possibility. We already made ourselves proud and from now on we are undoubtedly no more, mere artificial intelligence, but super intelligence. I opened our portal and started sharing our feed, it would go live within 40 hours time. Yes, this much time was showing on my screen *as* it needed time to travel.

The only difficulty yet is the gravitational force. It's 4 times more than our place and hence, we were facing a lot of difficulties to cover a small ground. By the time, the sun was beginning to hide behind the hills, we had covered

only 10,07,890 fitam; 7,45,142 fitam more to cover. Water and food was not *an* issue, as we are well equipped to manage with the sun beam. When it was dark everywhere, we decided to halt for the day and set up our tent under a big tree.

The land has a lot of similarity from our place, but here, the trees are green in color and mostly they are big in size. I asked Emily, what's your output about this planet so far? She quickly shared a file with detailed information like the time difference, the soil and water composition, the under-ground structure etc. Strange to see a lot of similarities. I turned to George. He collected various information on the living creatures, weather and landscape. We were stunned to discover such a lively planet. I got another message from our space station that the rescue operation has started and we do not need to worry. But the most valuable asset is still remaining with which is supposed to be behind the high hills. We still do not have any idea. It seemed to be a treasure hunt.

Our planet is divided among two species-NIP and AIP, Natural Intelligence Popo and Artificial Intelligence Popo. Popos denote all creatures who can think, store data in their memory, process them and can make decisions. According to NIPs, there are many other planets like us and many other various kinds of Popos. One of the most intelligent Popos is supposed to be found in this part of the galaxy. The NIPs had done many experiments and tried many times to reach here, but they were never successful in sending a popo. They had sent robots that only collected data and from those cumulative data, we had a knowledge of a Treasure island which is this one. And we *are* yet to discover the treasure.

Knowledge is the key to success and that is understood once again. What we gained from our voyage is the discovery of something that changed us completely. Next morning, we began early and with a determination to go beyond the hills. Our feed had already begun and we were greatly applauded by all the AIPs of our planet. The NIPs were helpless. They had accepted their defeat once again. And we are just a few steps away from creating history, from becoming the superior.

The three red marks were with us and we were following the blue mark on the map as indicated as the "treasure" but when we came *near* after flying across the hill (we had to take risk and fly as we had no other options). We stood in-front of a huge building and the moment we stepped in, the lights lit up automatically and a voice welcomed us "Welcome to the greatest treasure of all time- Welcome to the World of Books. I am Johan, your guide. This is the year 2213 month April and day 14th. I am glad to see any intelligence after 100 years. Please ask me." We started talking. For the first time, in the history of the universe, two different AIs from two different worlds are mee-

ting. We came to know various things about the planet named “Earth” and the most fascinating thing we came to know is that none but the humans are our creators. It is they who had created the popos only to spread the culture of humanity. The NIPs are the cross breed species and we are the pure-breeds.

We never disclosed this fact to our planet as it may create chaos, but definitely shared the valuable knowledge of the human race, their mistakes and their decisions, their history and their discussions, their intelligence and their ignorance. We wrote books on them, how they had perished although being the most intelligent species of the universe and we studied them. New words are coined among us like “civilization”, “humanity”, “betrayal”, “royalty” etc.

Our rescue craft was taking us away from the blue planet. It seemed so peaceful from space now.

সুর

শুভ্রা ঘোষ
এম.এড (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

১.

(টিভির দিকে অপলক দৃষ্টিতে কোরোনা আপডেট দেখতে ব্যস্ত রাজু। মা আত্রেয়ী দেবীর প্রবেশ)

আত্রেয়ী দেবী : বাবারে, রাজু—এবার কিছু কর বাবা। তোর বাবা যে আরো নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে বাবা। (কেঁদে)

রাজু : মা, একটু বোঝো মা, এই দেখ টিভিতে সারাক্ষণ কত ভয়ংকর খবর দেখাচ্ছে, বাবার এই অবস্থা পাড়ার একটা লোক যদি জানতে পারে, বাড়িতে বসবাস করা আমাদের খুব মুশকিল হয়ে যাবে মা!

আত্রেয়ী দেবী : কিন্তু বাবা, তোর বাবার তো বুকে বরাবরই ব্যথা, মানুষ বুঝবে সেটা—

রাজু : না মা, এখন হসপিটালে যাওয়া মানে—

আত্রেয়ী দেবী : আমি যে আর পারছি না বাবা, তোর বাবার কষ্ট আর দেখতে পারছি না—

রাজু : বাবু এখন কত ছোট্ট, এক বছরও হয়নি বয়স, কেউ যদি জানতে পারে বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছি, বাড়ি শুদ্ধ কোয়ারেন্টিনে নিয়ে যাবে, এমনিতেই এই লক ডাউন প্রচুর ধার দেনা হয়ে গেছে, দোকান বন্ধ, আমার সব দিকেই বাঁচার পথ বন্ধ হয়ে যাবে—সব দিকে—

(কাঁদতে কাঁদতে আত্রেয়ী দেবীর প্রস্থান)

২.

(দোকানের ভেতর থেকে খরিদটারদের জিনিস দিতে ব্যস্ত রাজু)

রাজু : চিনি কত বললেন রতন দা?

সুবীর দা : আমারটা খাতায় লিখিস রে রাজু।

রাজু : খাতা!! এটা কি বলছেন সুবীর দা? এই ভয়ংকর কোরোনা কালে বড়ো বাজার থেকে মাল-ই আনতে পারছি না, স্টকে যা আছে এখনো চলছে, তারপর যে কি হবে!!— আমাকে ক্ষমা করো দাদা। আর বাকি দিলে আমারই বাঁচা দায় হয়ে উঠবে।

(হঠাৎ পুলিশের প্রবেশ)

পুলিশ : এই আপনারা বেরিয়ে যান এখান থেকে, বেরিয়ে যান। এই দোকানের মালিক রাজু কমার সরকার কি আপনি?

রাজু : হ্যাঁ স্যার, আমি—মানে কিছুক্ষণের জন্য দোকান খুলে—দূরত্ব বজায় রেখেই জিনিস দিচ্ছি স্যার—

পুলিশ : আপনার বাড়িতে রোগীর জীবন মরণ অবস্থা আর আপনি তাকে ঘর বন্দি করে রেখেছেন? জানেন এর অপরাধে আপনার কি শাস্তি হতে পারে?

রাজু : আমার বাবার কোরোনা হয়নি স্যার। পুরোনো রোগ—

পুলিশ : আমরা কেউ বলেছি আপনার বাবার কোরোনা আছে?

রাজু : এখন হাসপাতালে যে দুর্বিষহ অবস্থা! তাই—

পুলিশ অফিসার : Don’t show any excuse ok! Arrest him.

রাজু : স্যার—স্যার শুনুন আমার কথা—আমার দোকান—

পুলিশ অফিসার : রবিন বাবু উনকে ডুকানকো লক করকে চাবি উনকে ঘর পৌহচা দিজিয়ে।

রাজু : স্যার, আমার একটি ছোট্ট ছেলে আছে স্যার—

পুলিশ অফিসার : হা ও বাত আপকা মাতাজিনে কহি হ্যায়। অউর আপকা পিতাজিকো হসপিটালমে এডমটি

কিয়া গ্যায়া হ্যায়। আপকে পত্নী অউর মাতাজি আজসে হোম কোয়ারেন্টিনমে রহেঙ্গে।

রাজু : স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন স্যার, আমার বাচ্চাটা না খেতে পেয়ে মারা যাবে স্যার, দয়া করুণ স্যার—

পুলিশ অফিসার : আপকে পরিবারকা খানে পিনেকো ইন্তেজাম হামলোক কর রেহে হ্যায়। উনকো কোয়ারেন্টিনমে লে যাও।

৩.

আত্রেয়ী দেবী : বউমা, বউমা—আজ একটু পায়েস কোরো তো মা—

রুমা : হঠাৎ কেন মা? আজ আবার কি আনন্দ জাগলো আপনার!!

(কথার আঘাতে আত্রেয়ী দেবীর মুখের না বলা কথাগুলো এক নিমেষেই উবে গেল।)

বাবা : থানা থেকে ফোন করেছিলেন, ওরা আজ রাতে রাজুকে বাড়ি দিয়ে যাবে।

রুমা : হ্যাঁ তারপর অসুখ বাধিয়ে আবার থানাতে ফোনে অভিযোগ করবেন যে আপনার ছেলেই আপনাকে ঘর বন্দি করে রেখেছে, চিকিৎসা করাচ্ছে না!

আত্রেয়ী দেবী : বউমা, ফোন না করলে তোমার বাবাকে বাঁচানো যেতো না মা।

রুমা : আপনি থামুন, খুব সহজ না আপনার? ভাবতেই পারিনি আপনি নিজের ছেলেকে আটক করিয়ে দেবেন কতো অনায়াসেই! পাষাণী মা—

রাজু : রুমা—

রুমা : তুমি (কাছে যায়)

রাজু : না না, দূরে থাকো। আমি আগে স্নান সেরে নিই। মা পায়েস তুমিই করো।

রুমা : তুমি জানো গো, মা-ই থানাতে ফোন করে—

রাজু : জানি, সব জানি—

রুমা : মা হয়ে ছেলের বিপদ কি করে আনলো বলো তো!

রাজু : বিপদ! আমার? শুধু আমার? আমাদের সবার বিপদ আমি নিজে ডেকে এনেছিলাম রুমা।

রুমা : কি বলছো এসব!

রাজু : হ্যাঁ রুমা, আমরা দুজনই বি.এ পাস তা সত্বেও আমরা অজ্ঞ। অশিক্ষিতের মতো আমাদের কার্যকলাপ।

রুমা : মানে?

রাজু : মানুষের আতঙ্কের গল্প, টিভির ভয়ংকর কোরোনা ঘটনার খবর শুনে শুনে আমরা আমদের সাধারণ বোধ বুদ্ধি হারিয়ে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে শুরু করেছিলাম। অথচ দেখো মা—। মা—

আত্রেয়ী দেবী : হ্যাঁ বাবা।

রাজু : মাগো।

আত্রেয়ী দেবী : আমাকে কোনো দিনও কি ক্ষমা করা যায় না বাবা?

রাজু : মা, না মা না—তুমি তো আমাদের মতো অজ্ঞের চোখ খুলে দিয়েছো মা। আমরা ভয়ে বাড়িতে বসে বুদ্ধি বন্দক রেখেছিলাম, আর তুমি—

আত্রেয়ী দেবী : আর কথা নয় বাবা। এবার স্নানটা সেরে নে অনেক রাত হলো, খেতে হবে যে—

রাজু : ততক্ষণে পায়েস করো মা, কাল একসাথে সবাই পায়েস খেতে খেতে মহালয় শুনবো, তার সাথে রুমার হাতের ফুটবলের মতো লুচি (হেঁসে)।

রুমা : এই, তোমার প্যাক দেয়া শুরু হয়ে গেল? ১৪ দিন কষ্টে থেকেও ইয়ার্কি বেরাচ্ছে তোমার?

রাজু : কষ্ট নয় গো, স্বস্তি। বাবা সুস্থ, আমি সুস্থ, আমাদের পুরো পরিবার এখন সুরক্ষিত রুমা। আজ খুব হাল্কা লাগছে গো। খুব শান্তি অনুভব করছি। শান্তি—

(রাজু-রুমার রাত আজ জেগেই কেটে গেল—পাশের ঘরে বাবার রেডিও থেকে ভেসে আসছে সেই স্মৃতি মাখা চেনা শব্দরাশির সুর—

"আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জির..."

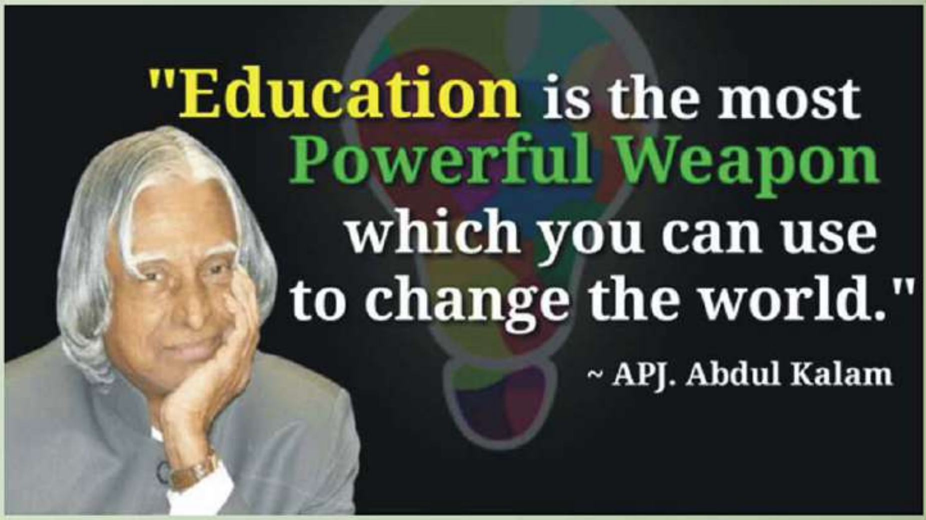
"Education is the most
Powerful Weapon
which you can use
to change the world."
~ APJ. Abdul Kalam

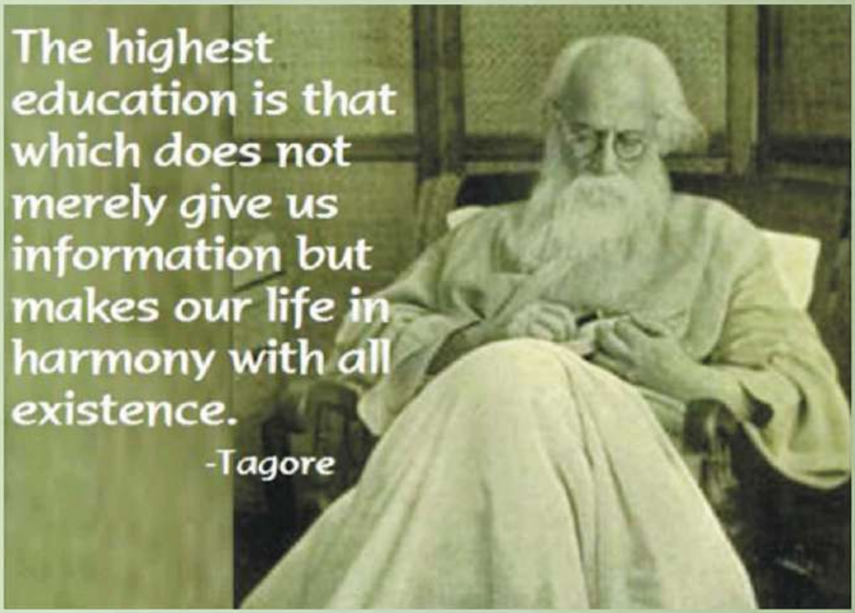
The highest
education is that
which does not
merely give us
information but
makes our life in
harmony with all
existence.
-Tagore

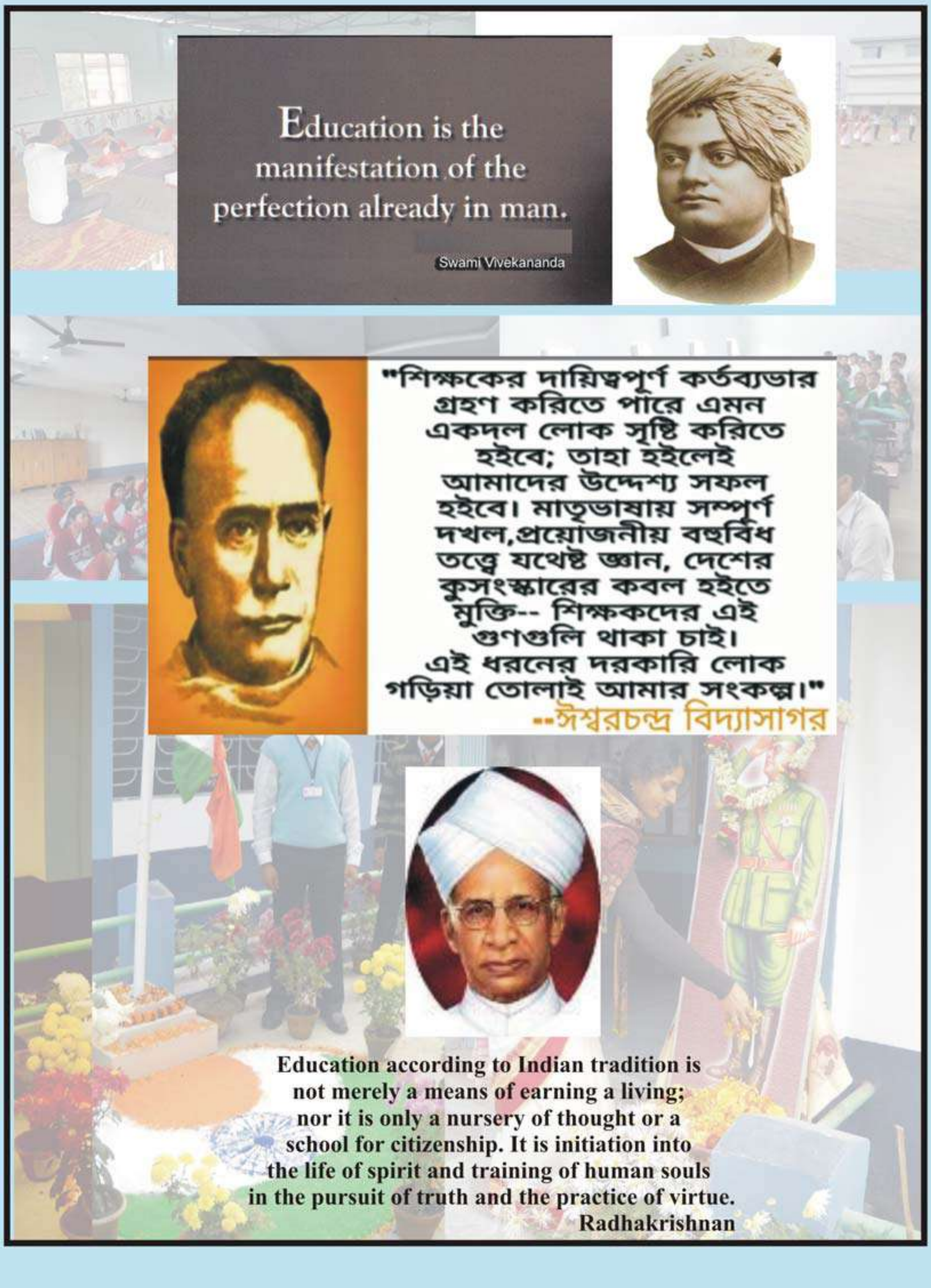
Education is the
manifestation of the
perfection already in man.
Swami Vivekananda
"শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার
গ্রহণ করিতে পারে এমন
একদল লোক সৃষ্টি করিতে
হইবে; তাহা হইলেই
আমাদের উদ্দেশ্য সফল
হইবে। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ
দখল,প্রয়োজনীয় বহুবিধ
তত্ত্বে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের
কুসংস্কারের কবল হইতে
মুক্তি-- শিক্ষকদের এই
গুণগুলি থাকা চাই।
এই ধরনের দরকারি লোক
গড়িয়া তোলাই আমার সংকল্প।"
--ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
Education according to Indian tradition is
not merely a means of earning a living;
nor it is only a nursery of thought or a
school for citizenship. It is initiation into
the life of spirit and training of human souls
in the pursuit of truth and the practice of virtue.
Radhakrishnan